শিল্প
সাহিত্য
সংস্কৃতি
আবদুস শহীদ নাসিম

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ০১

ISBN : 978-984-645-100-9

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা
ফোন : ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১৪

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ঃ ১৬৫.০০ টাকা মাত্র

SHIKKHA SHAHITTO SONGSKRITI By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Phone : 8317410, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com Ist Edition : November 1997, 2nd Print : June 2014.

Price Tk. 165.00 Only.

অনুবন্ধ

কোনো জাতির স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় তার সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস, দর্শন ও দৃষ্টিভংগির দর্পণ। একটি জাতির সংস্কৃতিই হয়ে থাকে তার শিক্ষার ভিত। সংস্কৃতি ধরা দেয় মানুষের আচরণে, অভ্যাসে উপাসনায়। সে শাখা বিস্তার করে শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে।

দূরাচারীরা দংশন করছে আমাদের সংস্কৃতিকে। বিপন্ন করছে আমাদের শিক্ষাকে। ভিত উপড়ে ফেলছে আমাদের শিল্প সাহিত্যের। সংশয়িত করছে আমাদের সপরিচয়কে।

আমরা চাই, আমাদের আগত এবং উত্তর প্রজন্ম আমাদের বাপ দাদার জীবনাচার ভুলে না যাক, আমাদের আদর্শ থেকে তারা অজ্ঞ না থাকুক। আমরা চাই, তারা আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতিতে সুসভ্য হোক। আমাদের ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস ও আদর্শের হোক তারা ধারক বাহক। আমরা চাই তারা আমাদের আদর্শিক মূল্যাবোধকে সংরক্ষণ করুক।

আমরা আরো চাই, আমাদের শিক্ষানীতি প্রণীত হোক আমাদের আদর্শিক মূল্যবোধকে ধারণ করে, আমাদের বিশ্বাসকে সমুন্নত করে। নৈতিক চরিত্র গঠন শিক্ষার

অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষানীতিতে আমাদের কিশোর তরুণদের নৈতিক চরিত্র গঠনের মানদন্ড হোক আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আদর্শ।

আমাদের শিল্প সাহিত্য হোক আমাদের আদর্শিক শিক্ষার বাহন। আমরা চাই, আমাদের সাহিত্যে মূল্যবোধের স্বকীয়তা আসুক। আমাদের সাহিত্য হোক আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ধারক বাহক।

এসব কথা আমার মনের তামান্না, দিলের আরজু, হৃদয়াবেগ, বিবেকের তাড়না, বিশ্বাসের বায়নামা। কিন্তু কিছু করার ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে প্রচুর অভাব। তবে স্বভাব বশত পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু লিখি। লিখি বিশ্বাস আর মূল্যবোধকে ঘিরে। ভাবি, হয়তো জাহাজ ভিড়বে কখনো সভ্যতার তীরে।

আশির দশক আর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ শিরোনামের ত্রিবলয়ে যা কিছু লেখা লেখি করেছি, এ সঞ্চিতা সেগুলোরই সমন্বয়। শিক্ষা দিয়ে শিরোনামের সূচনা হলেও গ্রন্থের গর্ভ সূচিত হয়েছে সংস্কৃতি দিয়ে। কারণ শিক্ষা সাহিত্য তো সংস্কৃতির ঔরসজাত। অনুপ্রাসের অনুপ্রেরণায় শিরোনামে সংস্কৃতি শেষে এসেছে।

এ গ্রন্থ যদি আমার কাংখিত সমাজ গড়ার কাজে কিছুমাত্র Input যোগায়, তবে আমার প্রভুর কাছে আমি অবশ্যি কিছু না কিছু output আশা করি।

আবদুস শহীদ নাসিম
ঢাকা
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সংস্কৃতি

মুখপাত

সংস্কৃতি সমাজের জনগোষ্ঠির বিশ্বাস ও জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হয়। কোনো সমাজের জনগোষ্ঠী যখন এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হয়, রিসালাতের অনুসারী হয় এবং পরকালের অনন্ত জীবনের আকাংখী হয় আর এর ফলে তাদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মানসিকতা, মননশীলতা, দৃষ্টিভংগি ও জীবনবোধ সৃষ্টি হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রকাশিত ও বিকশিত হয় জাতির জীবনাচারে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে। এগুলো সংস্কৃতির বাহক। ইসলামী সংস্কৃতি একটি গাছ, ঈমান হলো তার বীজ। মুমিনদের আদর্শিক জীবনবোধ, জীবনাচার, সামাজিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, রসম রেওয়াজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় এ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। এ এক অনন্য অনুপম সংস্কৃতি। আদর্শিক প্রেরণাই এর প্রাণ। ঐ সংস্কৃতি সুন্দর পৃথিবী গড়ার নিয়ামক আর পরকালীন সুখী জীবনের সহায়ক। এ এক শাশ্বত চিরন্তন সংস্কৃতি। নবীরা ছিলেন এ সংস্কৃতির মডেল ও প্রচারক। এ সংস্কৃতি এক আল্লাহ্‌মুখী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেঁতু বন্ধন। এ সংস্কৃতি পবিত্র জীবনধারা ও অনাবিল সৌন্দর্যের ধারক। এ সংস্কৃতির অনুসারীদের গোটা ইন্দ্রিয় নিচয় এক আল্লাহ্‌মুখী হয়ে যায়।

১

সংস্কৃতি কি?

ক. সংস্কৃতির সীমানা

আমাদের সংস্কৃতির সীমানা নির্ধারণ করতে হলে আগে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় পরিষ্কার করতে হবে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের পরিচয় কি? ভৌগলিক পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। ভাষার পরিচয়ে বাংগালি। সংস্কৃতি কিন্তু সবসময় ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকেনা। আবার কখনো থাকে সীমানার বিচ্ছিন্নতার কারণে। ভাষাকে কেন্দ্র করেও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তবে একই ভাষার লোকদের মধ্যে সংস্কৃতির বিভেদ থাকে, বিভাজন থাকে তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির বৈপরিত্যের কারণে। এটা স্বাভাবিক। যেমন আরবি মুসলমান আর আরবি ইহুদীদের সংস্কৃতি এক নয়। বাংগালি হিন্দু আর বাংগালি মুসলমানদের সংস্কৃতি এক নয়। তাহলে এটা পরিষ্কার হলো, রাজনৈতিক সীমানা আর ভাষা এর কোনোটিই সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি হতে পারেনা। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের সংস্কৃতির ভিত কি? এটি আসলে প্রশ্ন হওয়াই উচিত ছিলোনা। হওয়া উচিত ছিলো প্রশ্নাতীত। কিন্তু সম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আমাদের সংস্কৃতির ভিতে কুঠারাঘাত হানছে। অবশ্য সুপ্রোথিত এই ভিত কারো পক্ষেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তবু যেহেতু এই নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে, সেজন্যেই কথাটা পাড়লাম।

আসলে সংস্কৃতি তো উৎসারিত হয় মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি মনমানসিকতা এবং জীবন লক্ষ্যের চেতনা থেকে। এই জিনিসগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে যে জীবনবোধ, তারই প্রকাশ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোনো সংকীর্ণ জিনিস নয়। সাহিত্য, কিংবা বিশেষ ধরনের কোনো শিল্পকলার মধ্যে তা মোটেও

আবদ্ধ নয়। সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রশস্ত। তা গোটা মানব জীবন পরিব্যাপ্ত। সমাজের ষোল কলায় প্রতিভাত। এ প্রসংগে সংস্কৃতি বলতে বিশেষজ্ঞরা কি বুঝেছেন আর কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটাই আগে খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথমেই অভিধান খুঁজে দেখা যাক।

খ. উৎসের সন্ধানে

কোলকাতার 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত অশোক রায়ের 'সমার্থ শব্দকোষে' (জানুয়ারি ১৯৯০ সংস্করণে) সংস্কৃতির সমার্থ শব্দ এগুলোকে লিখেছেন ঃ

সংস্কৃতি ঃ কালচার, কৃষ্টি, তমদ্দুন। মার্জনা, পরিশীলন, পরিমার্জনা, অনুশীলন। সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা। রুচিশীলতা, রুচি, সুরুচি।

সাহিত্য সংসদ তাদের 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' সংস্কৃতির অর্থ নিম্নরূপ লিখেছে ঃ

সংস্কৃতি ঃ সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture.

'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্কার' শব্দ থেকে উদগত হয়েছে। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান 'সংস্কার' শব্দের অর্থ লিখেছে ঃ

সংস্কার ঃ শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, ধারণা বিশ্বাস সংস্কার।

সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Culture. আমাদের বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে একটি ভাল মানের ইংরেজি বাংলা অভিধান প্রকাশ করেছে। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত এই অভিধানটির নাম দেয়া হয়েছে BANGLA ACADEMY ENGLISH-BENGALI DICTIONARY. এই অভিধানটিতে কালচার অর্থ লেখা হয়েছে ঃ

Culture. সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোনো জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক বিকাশ। কোনো জাতির বৈশিষ্টসূচক শিল্প সাহিত্য বিশ্বাস সমাজনীতি।

আরবি ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে দুটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। একটি হলো 'সাকাফা' [ثقافة] আর অপরটি 'তাহযীব' [تهذيب]। প্রাচ্যবিদ Milton Cowan-এর আরবি ইংরেজি অভিধান 'মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল মুয়াসিরা' [A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN

ARABIC] একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিধান।১ এতে 'সাকাফা' ও 'তাহযীব' শব্দ দুটির অর্থ লেখা হয়েছে ঃ

সাকাফা (ثقافة) ঃ Culture, Refinement. Education, Civilization.

তাহযীব (تهذيب) ঃ Expurgation, Emendation, Correction, Rectification, Revision, Training, Instruction, Education, Upbringing, Culture, Refinement.

গ. সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আভিধানিক আলোচনা থেকে 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যাপক রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হলো। এবার দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির কী সংজ্ঞা দিয়েছেন?

T. S. Eliot বলেছেন ঃ

"কালচার হলো বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবন ধারা ও জীবন পদ্ধতি।"২

এলিয়ট সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন ঃ একটি হলো ভাবগত ঐক্য। আর দ্বিতীয়টি প্রকাশ ক্ষেত্রের সৌন্দর্য। Eliot আরেকটি বিবেচনাযোগ্য কথা বলেছেন। তাহলো ঃ

"মানুষ শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে Culture মনে করে। অথচ এগুলো Culture নয়। বরং এগুলো হলো সেইসব জিনিস, যেগুলো থেকে Culture সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।"৩

Philip Bagby বলেছেন ঃ

"সংস্কৃতি বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি এতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিক।"৪

মেথু আর্নল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

১.. Milton Cowan : A Dictionary of Modern Written Arabic, Third Printing librairie du liban Beirut and Macdonald & Evans Ltd. london 1980.

২. T. S. Eliot : Notes Towards the Defination of Culture. P 13.

৩. T. S. Eliot : Notes Towards the Defination of Culture. P120.

৪. Philip Bagby : Culture and History. P 80.

"সংস্কৃতি হলো মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। সংস্কৃতি হলো পূর্ণতা লাভ।"

বোয়া সংস্কৃতির তিনটি দিক বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো ঃ

"১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ২. অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজে সমাজে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ৩. মানসিক হাবভাব, ধর্ম, নীতি ও সৌন্দর্যজ্ঞান।"৫

Tylor তাঁর প্রিমিটিভ কালচার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"Culture is that Complex whole which includes knowledge, Belief, Art, Moral law, Custom and other Capabilities and habits aquired by man as a member of the society."

ঘ. আদর্শিক ও আদর্শ নিরপেক্ষ সংস্কৃতি

এ সংজ্ঞাগুলো থেকেও সংস্কৃতির ব্যাপকতা বুঝা যায়। এ ব্যাপকতার কারণেই বিশেষজ্ঞরা আজ পর্যন্ত সংস্কৃতির কোনো 'সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা' দিতে পারেননি। এর কারণ হলো, বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভংগির বিভিন্নতা। আসলে, দৃষ্টিভংগির প্রকাশই তো সংস্কৃতি। আদর্শিক দৃষ্টিতে যদি সংস্কৃতিকে ভাগ করা যায়, তবে সংস্কৃতি দুইভাগে বিভক্ত। এক ঃ আদর্শ নিরপেক্ষ বা ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত সংস্কৃতি এবং দুই ঃ আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতি। এখানে আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতি বলতে মানবতাবাদী অভ্রান্ত আদর্শের কথাই বলা হয়েছে।

অনেকের মতে, আদর্শ নিরপেক্ষ কোনো সংস্কৃতি নেই। তবে আমি বলবো, ভ্রান্ত দর্শনপ্রসূত সংস্কৃতি আছে। কি সেই ভ্রান্ত দর্শন? যেসব বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, জীবনলক্ষ্য ও জীবনবোধ অভ্রান্ত জ্ঞানপ্রসূত নয়, সেগুলোই ভ্রান্ত দর্শন।

অভ্রান্ত আদর্শ বলতে পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই আছে। ইসলাম মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস (ঈমান) ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, জীবন লক্ষ্য ও জীবনবোধ সৃষ্টি করতে চায়, সেটাই একমাত্র অভ্রান্ত আদর্শ।

আসলে আদর্শ চেতনাই সংস্কৃতি। কারণ, সংস্কার, সংশোধন, বিশ্বাস, পরিশীলন, পরিমার্জন, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, সভ্যতা, মানসিক বিকাশ,

---

৫. Boas : General Anthropology. P 4-5.

জীবন ধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, উন্নতি, উৎকর্ষতা এসবই আদর্শ চেতনা এবং আদর্শিক জীবনবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। এক কথায় এগুলো সবই সংস্কার। আর সংস্কার থেকেইতো এসেছে সংস্কৃতি। সুতরাং সংস্কৃতিতে বিকৃতি আর কুসংস্কার কিছুতেই থাকতে পারেনা। সংস্কৃতির অর্থই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়, বিকৃতি কিছুতেই সংস্কৃতি নয়। কুসংস্কারও সংস্কৃতি নয়। আর এটাতো স্বতসিদ্ধ কথা যে, আদর্শিক চেতনা থেকেই সংস্কারের প্রেরণা আসে। সংস্কারের প্রেরণা যদি হয় কুসংস্কার, কিংবা বিকৃতি, তবে সে সংস্কারটা সংস্কৃতি নয়।

ঙ. সংস্কৃতির উপাদান

সংস্কৃতি গড়ে উঠে পাঁচটি মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতে। সেগুলো হলো ঃ

১. জগত ও জীবন সম্পর্কে ধারণা,

২. জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য,

৩. আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি,

৪. বিশেষ ধরনের নৈতিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা,

৫. সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা।

এ উপাদানগুলো সম্পর্কে বিশ্বের কোনো মতবাদই যথার্থ ও প্রকৃত নির্দেশনা প্রদান করতে পারেনি। এগুলো সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগি আধুনিক মানব সমাজকে মানসিক অশান্তি আর নৈতিক অধঃপতনের অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে।

২

ইসলামী সংস্কৃতি

ক. দৃষ্টিভংগি

সংস্কৃতির উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ উপাদানগুলো সম্পর্কে একমাত্র ইসলামই দিয়েছে, নির্ভুল, যথার্থ ও যুক্তিসংগত দৃষ্টিভংগি ও পরিকল্পনা। ইসলাম বলে, এই বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই গোটা বিশ্বজগতের মালিক, শাসক ও পরিচালক। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম সত্তা। মহা পরাক্রমশীল তিনি। জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি। তিনি এক, একক, অনন্য। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা বা বিশেষ সম্পর্ক নেই। সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অসহায়, তাঁর দাসানুদাস। মানুষ তাঁর এক অসহায় সৃষ্টি। মানুষকে তিনি তাঁর দাসত্ব করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পৃথিবীতে তিনি মানুষকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। সেখানে সুপ্রমাণিত রেকর্ড পত্রের ভিত্তিতে মানুষের হিসাব নেয়া হবে। মানুষ পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে থাকলে সেখানকার বিচারে সে মুক্তি পাবে। তাকে চিরসুখের জান্নাতে বসবাস করতে দেয়া হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পূর্ণাংগ জীবন পরিচালিত না করে থাকলে সেখানকার বিচারে

সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। ফলে তাকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে।

ইসলাম বলে, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য লাভ। আর মুক্তি ও সাফল্য লাভ হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র মর্জিমতো জীবন যাপন করার মাধ্যমে। তিনি সন্তুষ্ট হলেই মানুষের জীবন সফল। সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাত লাভ করবে। তিনি তাঁর রসূলের মাধ্যমে তাঁর মর্জিমতো জীবন যাপন করার বিধান পাঠিয়েছেন। রসূল তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র রসূল প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর পরকালের মুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ইসলাম বলে, মানুষের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি গড়ে উঠবে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। ফলে তার বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভংগি হবে অত্যন্ত প্রশস্ত, মানবতাবাদী, মানব কল্যাণের দিশারী, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এবং ইহকাল ও পরকাল পরিব্যাপ্ত।

ইসলামের দৃষ্টিতে, মানুষকে নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ গুণাবলী অর্জন করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হতে হবে। তার মন হবে যেমন পবিত্র অনাবিল, তেমনি চরিত্রও হবে নিষ্কলুষ পূতপবিত্র। সত্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, মহানুভবতা, মানবতাবোধ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাহস, বীরত্ব, বীর্যবত্তা, প্রেম, ভালবাসা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি মহান গুণাবলী অর্জন করার জন্যে সে চালিয়ে যাবে অবিরাম প্রচেষ্টা। সে নিজেকে সংস্কার, সংশোধন ও মার্জিত পরিশুদ্ধ করে নেবে সমস্ত পাপ, পংকিলতা, অন্যায়, অসততা, দুর্বলতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা ও অসৎ গুণাবলী থেকে। এভাবে নিজেকে উন্নত উৎকর্ষ ও বিকশিত করার জন্যে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে সারা জীবন।

ইসলাম মানুষকে এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে যার মূলনীতি হবে ঃ

ক. আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য

খ. মানবতাবাদ এবং

গ. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব।

খ. ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সংস্কৃতির পাঁচটি উপাদান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। এই দৃষ্টিভংগির আলোকে যে জীবনবোধ, জীবন চেতনা, সমাজ চেতনা ও মানবতাবোধ সৃষ্টি হয়। সেগুলোই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি তো মানুষের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা। তাই ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করে তারই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।

আমার মতে, ইসলামী সংস্কৃতির উপর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি রচনা করেছেন মাওলানা মওদূদী। তিনি বলেন ঃ

> "ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো, মানুষকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে প্রস্তুত করা। .... এ সংস্কৃতি একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা কল্পনা, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত।"

> "ইসলামী সংস্কৃতি কোনো জাতীয় বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। প্রকৃত অর্থে এ হলো 'মানবীয় সংস্কৃতি।'.......এ সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন উদার জাতীয়তা গঠন করে। এর মধ্যে বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সবমানুষই প্রবেশ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন হবার মতো ব্যাপকতা।"

> "সীমাহীনতা এবং বিশ্বজনীনতার সাথে সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) আর শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি তার অনুসারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব বিধানের অনুগত করে তোলে।"

> "এ সংস্কৃতি পৃথিবীতে একটি নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গড়ে তুলতে চায় একটি সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society)।........ সে চায় সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি করতে।"[৬]

---

৬. সাইয়েদ মওদূদী ঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা।

একটি অনুপম চিত্র আমরা এখানে পেলাম। সংস্কৃতির যতো সুন্দর সুন্দর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলোর পূর্ণাংগ রূপ কেবল ইসলামী সংস্কৃতিতেই পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী আদর্শই একমাত্র নির্ভুল ও মানবতাবাদী আদর্শ। আর ইসলামী সংস্কৃতিই প্রকৃত সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বুঝায় এবং মানুষ ও মানব সমাজের যতো মার্জিত, পরিশুদ্ধ, সংস্কারপ্রাপ্ত ও মননশীল দিক থাকতে পারে, সেগুলোকে যথার্থ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দিতে পারে কেবল ইসলাম।

এ প্রসংগে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া দরকার। তাহলো ইসলামী সংস্কৃতি আর মুসলিম সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। এ প্রসংগে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী মরহুম ডঃ হাসান জামানের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। তিনি বলেনঃ

"ইসলামী তমদ্দুনের* স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মুসলিম তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনে আসমান যমীন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন না-ও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা যায়না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে।------- মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবেনা। কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবেনা। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামী নীতির সংগেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই।........ইসলামী জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরই নির্ভর করে ইসলামী তমদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি।"[৭]

বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি। আর আল কুরআন এবং সুন্নাহ্ই হলো ইসলামী আদর্শের ভিত্তি। সুতরাং ইসলামী আদর্শ হলো কুরআন সুন্নাহ্র ভাবধারা প্রসূত। কুরআন সুন্নাহ্র ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারেনা, চাই সেটা মুসলিম রাজা বাদশাদের সংস্কৃতি হোক, কিংবা হোক আদর্শ বিচ্যুত মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি।

---

* এখানে সংস্কৃতি অর্থে 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. ডঃ হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য ঃ প্রথম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭।

বস্তুবাদী মানসিকতা যেসব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করে, ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে সেগুলো সবই সংস্কৃতি নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী সবকিছুই অপসংস্কৃতি। যে মানসিকতা মানবতার ক্ষতি সাধন করে, মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তা সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি।

পাশ্চাত্যের কোলে ভূমিষ্ট হয়ে সেখানেই লালিত পালিত ও সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন মারগারেট মারকিউস। অনুপম মেধাবী ছাত্রী মারগারেট নিজের চোখ ও মনমগজ দিয়ে স্ক্যানিং করে দেখেছেন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ ও সংস্কৃতিকে। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছেন পাপ আর পংকিলতার আবর্জনা। তাই তিনি ইসলামকে অধ্যয়ন করেন। অবিভূত হন ইসলামী নীতিমালার পরম সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। তাঁর একটি বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয় ঃ

> "ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও প্রকৃতি অনুসারে পারলৌলিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্য পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানুষের চরিত্রকে নিষ্কলুষ ও নির্মল অনাবিল করে গড়ে তোলার জন্যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়াই হলো সবচেয়ে বড় চারুকলা। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস মানুষের দৃষ্টিতে এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সর্বোতভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।"৮

বলাবাহুল্য, ইসলামের এই মহান লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে পেরেই মারগারেট ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন তাঁর নাম মরিয়ম জামিলা। তাঁর বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হলো, বস্তুবাদ যে চারুকলাকে সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ মনে করে, সেটা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি নয়। প্রকৃত সংস্কৃতি হলো, মানব জীবনের একটা মহান লক্ষ্য স্থির করে এবং সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যে মানব চরিত্রকে নির্মল ও নিষ্কলুষ করার অবিশ্রান্ত প্রয়াস। এটাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।

আল্লাহ্ ইসলামকে 'দীন' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'দীন' মানে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। তাই দীন যেমন পূর্ণাংগ জীবন পরিব্যাপ্ত, তেমনি সংস্কৃতিও পূর্ণাংগ জীবন পরিব্যাপ্ত। আর ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণাংগ রূপায়ন তখনই ঘটে, যখন দীন ইসলাম পূর্ণাংগরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়। তাইতো দেখি ফায়জী ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামী সংস্কৃতি হলো ঃ

> "১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো একযুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

---

৮. Mariam Jamila : Islam Verses the West.

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইসলাম সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করেছে তা।

৩. ইসলামী সমাজে মুসলমানদের জীবন ধারা, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, ভাষা ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি।"[৯]

এম, জেড, সিদ্দীকীর মতে ঃ

"ইসলামী সংস্কৃতি বলতে দুটি জিনিস ধরা হয়। একটি হলো তার চিরন্তন দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্থা। কিন্তু আমরা কেবল প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি। কারণ সংস্কৃতি তো হলো এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠে। যেমন ঃ আল্লাহ্‌র একত্ব, মানুষের উচ্চ মর্যাদা এবং মানব সমাজের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।[১০]

গ. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট

সংজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্টও পরিষ্কার হলো। তবে বৈশিষ্টগুলো আরো একটু স্পষ্ট করা যাক।

মর্মাডিউক পিকথল একজন খ্যাতনামা বৃটিশ প্রাচ্যবিদ। ইসলামের শাশ্বত আহবান উপলব্ধি করতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"Culture means cultivation and, as the word is generally used now-a-days when used alone, especially the cultivation of the human mind. Islamic culture differs from other cultures in that it can never be the aim and object of the cultivated individual, since its aim, clearly stated and set before every one, is not the cultivation of the individual or group of individuals, but of the entire human race. No amount of works of art, or works of literature, in any land can be regarded as the justification of Islam so long as wrong, injustice and intolerance remain. No victories of war or peace,

---

৯. Faizee : Islamic Cultire P. 6 .
১০. M. Z. Siddiqui : International Colloqium P. 26.

however brilliant, can be quoted as the harvest of Islam. Islam has wider objects, grander views. It aims at nothing less than universal human brotherhood. Still, as a religion, it does encourage human effort after self and race-improvement more than any other religion and since it became a Power in the world, it has produced cultural results which will bear comparison with the results achieved by all the other religions, civilizations and philosophies put together. A Muslim can only be astonished at the importance, almost amounting to worship, ascribed to works of art and literature - which one may call the incidental phenomena of culture-in the West; as if they were the justification, and their production the highest aim, of human life. Not that Muslims despise or ever should despise, literary, artistic and scientific achievements; but that they regard them in the light of blessings by the way; either as aids to the end or refreshment for the wayfarer. They do not idolise the aid and the refreshment.

The whole of Islam's great work in science, art and literature is included under these two heads - aid and refreshment. Some of it, such as the finest poetry and architecture, falls under both. All of it recognises one leader, follows one guidance, looks towards one Goal. The leader is the Prophet [PBUH], the guidance is the Holy Quran and the Goal is Allah.

By Islamic culture, I mean not the culture, from whatever source derived, attained at any given moment by people who profess the religion of Islam, but the kind of culture prescribed by a religion of which human progress is the definite and avowed aim.

No one who has ever studied the Quran will deny that it promises success in this world and hereafter to men who act upon its guidance and obey its laws; that it aims at nothing less than the success of mankind as a whole; and that this success is to be attained by cultivation of man's gifts and faculties.

If any development in Muslim society is not sanctioned by the Quran or some express injunction of the Prophet, it is un-Islamic and its origin must be sought outside the Islamic polity. The Muslims cannot expect success from their adoption of it, though it need not necessarily militate against success. If any development is contrary to an express injunction of the Quran, and against the teaching and example of the Prophet, then it is anti-Islamic; it must militate against success, and Muslims simply court disaster by adopting it."[11]

মাওলানা আবদুর রহীম মরহুমের মতে ঃ

"ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান (Values)। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে সেসব মূলনীতি, যেগুলোর উপর আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থিতি নির্ভরশীল।............... সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো হলো ঃ ১. তাওহীদ ২. মানবতার সম্মান ৩. বিশ্বব্যাপকতা, সার্বজনীনতা ৪. ভ্রাতৃত্ব ৫. বিশ্ব শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৬. বিশ্ব মানবের ঐক্য ৭. কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি ৮. পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ৯. পংকিলতা মুক্ত হওয়া ১০. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ১১. ভারসাম্যতা, সুষমতা ও সাম্য। এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।"[১২]

---

১১. M.M. Pichthal : Cultural Side of Islam P. 1-3.

১২. জাহানে নও ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট সম্পর্কে চমৎকার মতামত পেলাম। আমাদের মতে সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও এক আল্লাহমুখীতা।

২. আল্লাহ প্রেম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা।

৩. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা।

৪. আত্মশুদ্ধি, আত্মার প্রশান্তি।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ।

৬. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা।

৭. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ।

৮. সৌন্দর্যবোধ।

৯. দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যবোধ।

১০. উদারতা ও মনের বিশালতা।

১১. আত্ম সম্মানবোধ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ।

১২. মানবতাবোধ।

১৩. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

১৪. মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

১৫. মানবতার ঐক্যবোধ।

১৬. আত্মীয়তাবোধ।

১৭. সামাজিকতাবোধ।

১৮. নির্লোভ ও নিরহংকার মানস।

১৯. দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা ও ভালোবাসা।

২০. নেতৃত্ববোধ।

২১. বিনয়, আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ।

২২. আদর্শবোধ, রিসালাতের অনুবর্তন।

২৩. মিশনারি মনোভাব।

২৪. সুবিচার।

২৫. সহিষ্ণুতা।

২৬. ভারসাম্যতা।

২৭. বিশ্বজননীতা ও সার্বজনীনতা।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট পেশ করা যদিও একটি জটিল বিষয়, তবু আশা করি এযাবতকার আলোচনা থেকে আমরা সম্ভবত ইসলামী সংস্কৃতির একটি মোটামুটি পরিস্ফুট ছবি পেয়েছি।

৩

ইসলামী সংস্কৃতির চারটি অনন্য বৈশিষ্ট

ক. আল্লাহমুখীতা

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান একটি দর্শন। এ দর্শন তওহীদি দর্শন। ব্যক্তির যাবতীয় বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, চিন্তা ভাবনা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, ঘৃণা ভালবাসা, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, কামনা বাসনা, চাওয়া পাওয়া, আবেগ উদ্বেগ এক আল্লাহ্র সাথে কেন্দ্রীভূত করে দেয়াই এ দর্শনের মূল কথা।

আল্লাহ্ তা'আলা আল কিতাবে মানব জীবনের সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই সাথে রসূল পাঠিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র নির্দেশনাসমূহ কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কিভাবে জীবনের সকল বিভাগ তওহীদি দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হয়, তার অবিকল রূপায়ণ ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে তিনি এ দর্শনকে রূপায়িত করে গেছেন। আল কিতাবের বাস্তব রূপ ছিলো তাঁর জীবন। হযরত আয়েশার ভাষায় "কা-না খুলুকুহুল কুরআন- কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র।"

রসূলুল্লাহ্র গোটা জীবন নিবেদিত ছিলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায়, তাঁর হুকুম পালনের চেতনায়, তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের অনুভূতি আর অনিচ্ছাও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার তাড়নায়।

আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসা তাঁকে উদ্বেলিত করতো প্রতিনিয়ত। পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনা তাঁকে সচেতন রাখতো প্রতি মুহূর্ত। জাহান্নামের ভয়ে ভীত আর জান্নাতের আকাংখায় উজ্জীবিত হতেন তিনি প্রতি রাত্র। সে কারণেই

তাঁর যিন্দেগি তৈরি হয়েছিল রব্বুল আলামীনের ইচ্ছার মতো। তাঁর সাথিদের জীবনও ছিলো তাঁরই জীবনানুসৃত।

এভাবে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস, রিসালাতের মডেল আর পরকালের মুক্তি ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে যে কালচার, তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

এই শাশ্বত বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংস্কৃতি তাই সর্বাংগীন সুন্দর, একেবারে নিখুঁত, অনাবিল স্ফটিকের মতো। এর প্রতিটি অংগ স্বচ্ছ শিশিরের মতো।

এ সংস্কৃতি এমন এক সংস্কৃতি, এমন এক কালচার, যেখানে শুধু মনের আনন্দই নয়, আত্মার প্রশান্তিও আছে। এখানে হৃদয়মনের প্রশস্ততা কেবল ইহ জাগতিক নয়, পরকাল পরিব্যাপ্ত। এখানে মন সেচ্ছাচারী নয়, সহস্রগামী নয়, মন তার মনিবের অনুগত। এখানে মন শত মনিবের অনুশাসন মানেনা, একক স্রষ্টাই কেবল তার মনিব। এখানে মনের স্রষ্টা কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি সার্বভৌম হুকুমকর্তা। তিনি শুধু কঠোর শাস্তিদাতাই নন, তিনি বিধানদাতা, দয়াময়, করুণাসিক্ত, ক্ষমাশীল। অনুগতদের সাহায্যকারী তিনি, পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত তিনি।

তাই ইসলামী সংস্কৃতি বহুগামী নয়, রব্বুল আলামীনের অনুগামী। শুধু মন নয়, আত্মারও উদ্বোধক।

এসব কারণে ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য অনুপম। এর মহিমা বললে ফুরায়না। এর সুফলের শেষ নেই্। এর বাহকরা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্য। আল কুরআনে তাদের জীবন লক্ষ্যের ছবি আঁকা হয়েছে এভাবে ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ،

"বলো ঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু একমাত্র বিশ্ব নিখিলের মালিক আল্লাহ্‌র জন্যে, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।" [সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২-৬৩]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ

لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،

"আল্লাহ্ই মুমিনদের থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১১১]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ،

"যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, তারা তো কেবল আল্লাহ্র পথে লড়ে যায়।" [সূরা আন নিসা ঃ ৭৬]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ.

"মানুষের মাঝে এমন একদল লোক আছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জীবন সমর্পণ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল দয়াবান।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২০৭]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَداً، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَذَالِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ : (البينة : ٧-٨)

"যারা ঈমানের পথ ধরেছে এবং সততা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করেছে, তারা নিশ্চিতই সৃষ্টির সেরা। তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের মনিবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ভূমি চিরে বয়ে চলেছে রাশি রাশি ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি হয়েছেন সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি পরম সন্তুষ্ট। এগুলো সেসব লোকদের জন্যে, যারা তাদের মনিবকে ভয় করে চলে।" [সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৭-৮]

এ ক'টি আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, ইসলামী সংস্কৃতি এক আল্লাহমুখী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বাহকরা কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও

গোলামিই করে। জীবনে কেবল তাঁর হুকুমকেই রূপায়িত করে। তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে লড়াই করে যায়। তাঁরই হুকুম পালনের জন্যে বেঁচে থাকে, কেবল তাঁরই সান্নিধ্য লাভের জন্যে মৃত্যু বরণ করে। তারা কেবল তাঁরই পুরস্কারের পরম আকাংখী। তাঁর ভয় এবং তাঁর ভালবাসাই তাদের উজ্জীবিত করে। তাদের সমস্ত চেতনা জুড়ে এক আল্লাহ্‌র জীবন্ত অনুভূতি তীব্রভাবে বিদ্যমান।

খ. পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট এর পূতধর্মীতা, পবিত্রতা, অনাবিলতা, প্রশস্ততা ও নির্মলতা। এক আল্লাহ্‌মুখী হবার কারণে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা হয়ে থাকে সব ধরনের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলংগতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাষন্ডতা, হিংস্রতা, অমানবিকতা, যুল্‌ম, নির্যাতন, অন্যায় অবিচার, অসুন্দর, বেহুদা, বেমানান, বেতমিজি, বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের –

ক. চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে, মনকে পবিত্র করে;

খ. চরিত্র, আচার আচরণ ও কথাবার্তাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, ভদ্র ও সুন্দর করে।

গ. দেহ এবং পোষাক পরিচ্ছেদকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল করে।

আল কুরআন চিন্তা, চরিত্র এবং দেহ ও পোষাকের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তীব্রভাবে তাকিদ করেছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (الاعلى : ١٤)

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অবলম্বন করেছে।" [সূরা আল আ'লা ঃ ১৪]

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا (الشمس : ٩-١٠)

"নিসন্দেহে সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করেছে আর যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।" [সূর আশ শাম্‌স ঃ ৯-১০]

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلاً مِنكُمْ يَتْلُوْ عَلَيكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ١٥١)

"আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ পরিপাটি করে দেয়, তোমাদেরকে আমার কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং এমন সব জিনিস তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতেনা।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

"হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! উঠো এবং (মানুষকে) সতর্ক করো। তোমার পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র রাখো আর আবিলতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। [সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৫]

মনের বড় আবিলতা হলো অহংকার বা হঠকারিতা। আল কুরআন তীব্রভাবে এর নিন্দা করেছে এবং এর অশুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছে ঃ

قِيلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ،

"তাদের বলা হবে ঃ জাহান্নামের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করো। এখানেই তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। হঠকারী লোকদের ঠিকানা এমনি নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।" [সূরা যুমার ঃ ৭২]

নৈতিক পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ। এ গুণই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এর অভাবেই মানুষ পশুতে পরিণত হয়। নৈতিক পবিত্রতাই প্রকৃত ইসলামী কালচার ঃ

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ،

"নিসন্দেহে তোমার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। কারণ, তুমি অবশ্যি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। [সূরা আল কলম ঃ ৩-৪]

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ يَزْنُوْنَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا،

"(আল্লাহ্‌র প্রিয় দাসদের বৈশিষ্ট হলো) তারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ্ ডাকেনা, আল্লাহ্ যে প্রাণকে হারাম করেছেন, কোনো সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেনা এবং তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়না। -এসব যে-ই করবে, সে পাপের শাস্তি ভোগ করবে।" [সূরা ফুরকান ঃ ৬৮]

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ- وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا- وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا- اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلٰمًا- خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا- (الفرقان)

"(আল্লাহ্‌র প্রিয় দাসদের আরো বৈশিষ্ট হলো) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, কোনো বাজে বেহুদা জিনিসের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়, তাদেরকে যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয়, তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকেনা। তারা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে ঃ আমাদের মনিব! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদেরকে মুত্তাকি লোকদের অগ্রগামী বানাও। -এসব লোক নিজেদের ধৈর্যের ফল উচ্চ মনযিল আকারে পাবে। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অতিশয় চমৎকার হবে তাদের সেই আশ্রয় ও আবাস।" [সূরা আল ফুরকান ঃ ৭২-৭৬]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، (المائده : ٩٠)

"হে ঈমান গ্রহণকারীরা! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর এসবই হলো শয়তানি কার্যকলাপ। তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকো। তবে আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। " [সূরা মায়িদা ঃ ৯০]

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (الانعام : ١٢٠)

"তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার পাপ ত্যাগ করো।" [সূরা আল আন'আম ঃ ১২০]

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّاتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا- وَلَاتَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ- نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ- وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ- (الانعام : ١٥١)

"হে মুহাম্মদ! তুমি ওদের বলো ঃ এসো আমি তোমাদের বলে দিই তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর কি কি বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন ঃ

১. তোমরা তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা,

২. বাবা মার সাথে উত্তম আচরণ করো,

৩. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা। তোমাদের জীবিকাও তো আমি দিচ্ছি, তাদেরও দেবো,

৪. অশ্লীল ও ফাহেশা কাজ গোপন হোক প্রকাশ্য হোক, তার ধারে কাছে যেয়োনা,

৫. আল্লাহ্ যে জীবনকে মর্যাদা দান করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করোনা।

তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, আশা করা যায়, তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটিয়ে কাজ করবে।" [সূরা আল আন'আম ঃ ১৫১]

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْابِاللّٰهِ، (الاعراف)

"হে মুহাম্মদ! ওদের বলো ঃ আমার প্রভু নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন ঃ ১. প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা ২. পাপ ৩. সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং ৪. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা।" [সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৩]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا،

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। ওটা জঘণ্য অশ্লীল কাজ এবং চরম নিকৃষ্ট পন্থা।" [সূরা বনি ইস্‌রাঈল ঃ ৩২]

ইসলাম মানসিক নৈতিক পবিত্রতার সাথে সাথে দৈহিক পবিত্রতার প্রতিও অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে ঃ

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا، وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَاۤئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا، (النساء : ٤٣)

"হে ঈমান গ্রহণকারীরা! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়োনা। নামায পড়বে তখন, যখন কি বলছো তা অনুধাবন করতে পারো। অপবিত্র অবস্থায় ও গোসল করার আগ পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়োনা। তবে ভ্রমণরত থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আর তোমরা যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ো, বা ভ্রমণরত থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসো, অথবা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকো আর পবিত্র হবার জন্যে পানি না পাও, তবে পাক পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো। তা নিজেদের মুখমন্ডল ও হাতের

উপর বুলাও। নিসন্দেহে আল্লাহ্ কোমল ও ক্ষমাশীল।" [সূরা নিসা ঃ ৪৩]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ- وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا- وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ - مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِن يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . (المائده : ٦)

"হে ঈমান গ্রহণকারীরা! তোমরা যখন নামাযের প্রস্তুতি নেবে, তখন ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমন্ডল আর কনুই পর্যন্ত দুই হাত, তাছাড়া মাথা মুছে নাও এবং গেরো পর্যন্ত দুই পা ধুয়ে নাও। আর তোমরা যদি অপবিত্র অবস্থায় থাকো, তবে গোসল করে পবিত্র হয়ে নাও। তবে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকো, বা সফরে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে, অথবা যদি তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক পবিত্র মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নাও। মাটি দিয়ে নিজের মুখমন্ডল ও হাত মুছে নাও। তোমাদের উপর সংকীর্ণতা ও জটিলতা চাপিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে এবং তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।" [সূরা আল মায়িদা ঃ ৬]

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ. قُلْ هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ . (البقرة : ٢٢٢)

"তোমার কাছে তারা নারীদের ঋতুকাল সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো ঃ সেটা একটা অশূচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। সে সময় তোমরা স্ত্রী সহবাস পরিহার করো এবং তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়োনা। অতপর তারা যখন পাক পবিত্র হয়ে যাবে, তখন সহবাস করো, যেভাবে করতে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে এবং পূত পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২২২]

পানাহারের ক্ষেত্রেও ইসলাম পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। মরা, পঁচা ও অপবিত্র জিনিস পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ، اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، (البقرة : ١٧٢-١٧٣)

"হে ঈমান গ্রহণকারীরা! তোমরা যদি সত্যি আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে থাকো, তবে তোমরা আমার দেয়া পাক পবিত্র জিনিস খাও আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শুয়োরের গোশ্‌ত এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত প্রাণী। এগুলো তোমরা খেয়োনা। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে এবং আইন ভংগ করার হঠকারী মানসিকতা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে এগুলোর মধ্য থেকে কোনোটা খায়, সেজন্যে তার কোনো পাপ হবেনা। কারণ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়। [সূরা বাকারা ঃ ১৭২-১৭৩]

ইসলামী সংস্কৃতিতে কথার পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কালচারের বাহকরা সবসময় সুন্দর ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন কথাই বলে থাকে ঃ

وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ. (الحج : ٢٤)

"তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন কথা বলার এবং দেখানো হয়েছে সপ্রশংসিত মহান আল্লাহ্‌র পথ।" [সূরা আল হজ্জ ঃ ২৪]

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاۤءِ. تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ، وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ. (ابراهيم : ٢٤-٢٧)

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা আল্লাহ্ কী চমৎকার উপমা পেশ করছেন ঃ একটি ভালো পবিত্র কথা একটি ভালো পবিত্র গাছের মতোই, যার শিঁকড় মাটির গভীরে প্রোথিত, আর শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। প্রতি মুহূর্তে সে ফলদান করছে তার প্রভুর নির্দেশে। এ উপমা আল্লাহ্ এ জন্যে দিচ্ছেন, যাতে করে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে একটি মন্দ কথার উপমা হচ্ছে একটি মন্দ গাছ, যাকে সহজেই উপড়ে ফেলা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ ঈমান গ্রহণকারীদের মজবুত শাশ্বত কথার ভিত্তিতে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর পাপাচারীদের করে দেন পথ ভ্রান্ত। আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। [সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا، اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ،

"যে মান সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক সমস্ত মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্‌র। তাঁর কাছে কেবল পবিত্র কথাই উপরের দিকে আরোহণ করে আর সৎ ও পরিশুদ্ধ কর্মই তাকে উপরে উঠায়। যারা অনর্থক চালবাজি

করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর তাদের চালবাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আপনাতেই। [সূরা ফাতির ঃ ১০]

মুমিনদের সংস্কৃতি সর্বাংগীন পবিত্র সংস্কৃতি। অশ্লীল, নোংরা, পাপাচারী ও অপবিত্র সংস্কৃতির সাথে এর কোনো তুলনাই হয়না। এ সংস্কৃতি মানুষকে তার মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে ঃ

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوااللّٰهَ يَااُولِى الْاَلْبَابِ، (المائدة : ١٠٠)

"হে মুহাম্মদ! ওদের বলো ঃ পবিত্র আর অপবিত্র কখনো সমান সমকক্ষ হয়না, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতোই চমৎকৃত করুকনা কেন? কাজেই তোমরাই বুদ্ধিমানেরা আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" [সূরা মায়িদা ঃ ১০০]

সুতরাং ঈমানের পথে আসা এবং পবিত্র পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া অর্থাৎ ইসলামী কালচারের অনুসারী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ। এতে তার দুনিয়ার জীবন হয় পবিত্র আর পরকালীন জীবনে হয় সে পুরস্কার প্রাপ্ত ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ،

"যে কোনো মুমিন সৎ ও পরিশুদ্ধ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করাবো আর পরকালে দেবো তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান।" [সূরা আন নহল ঃ ৯৭]

গ. মানবতাবোধ

ইসলামী কালচারের আরেক অনুপম বৈশিষ্ট হলো মানবতাবোধ। মুমিনের জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। বরং এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হলো, মানুষের জন্য অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়। মানব কল্যাণে ব্রত হয়। মানুষের উন্নতি ও সর্বাংগীণ সুখ শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ

বোধ থেকেই মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে। মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হলে, মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন হলে অপর মানুষদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এটাই হলো ইসলামী সংস্কৃতির শাশ্বত রূপ।

এ বোধের অভাবেই মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। মানুষ মানুষকে দুঃখ কষ্ট দেয়। মানুষের দুঃখ কষ্টে মানুষ ব্যথিত হয়না। মানুষ মানব কল্যাণে এগিয়ে আসেনা, মানব সেবায় ব্রত হয়না। এটা নিষ্ঠুরতা, পাষন্ডতা, অমানবিকতা বরং পাশবিকতা। কুরআনের দৃষ্টিতে এদের অবস্থা হলো ঃ

তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তাতে বোধ নেই।
তাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তাতে অন্তরদৃষ্টি নেই।
তাদের কান আছে বটে, কিন্তু তাতে শ্রবণ শক্তি নেই।
এদের অবস্থা হলো পশুর মতো। বরং পশুর চাইতেও বিভ্রান্ত। এরা চরম চেতনা বোধহীন। (আল কুরআন ৭ ঃ ১৭৯)
মূলত এটাই হলো জড়বাদী খোদাহীন সংস্কৃতির বীভৎস রূপ।

● মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক

মানুষের সাথে মানুষের বহু রকম সম্পর্ক থাকে। অধিকাংশ সম্পর্কই ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভংগুর কিংবা স্বার্থগত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে মানুষের মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্ক তিনটি ঃ

১. মানবিক সম্পর্ক,
২. রক্ত সম্পর্ক/আত্মীয়তার সম্পর্ক,
৩. ঈমানি সম্পর্ক/বিশ্বাসগত সম্পর্ক,

এই তিনটি সম্পর্কই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কগুলো যদি দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া মায়া এবং দরদ ও মহব্বতের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই মানব সমাজে নেমে আসে সুখ, শান্তি আর উন্নতির ফল্গুধারা।

কিন্তু এ সম্পর্কগুলো যদি এসব মহত গুণাবলীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, এগুলো যদি দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, অবিচার, যুলুম নিপীড়ন, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ বিসম্বাদ, অসাধুতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কবলে আপতিত হয়, তবে মানব সমাজে কিছুতেই নেমে আসতে পারেনা সুখ শান্তি আর উন্নতির ফল্গুধারা।

ইসলামী কালচারে এ তিনটি সম্পর্কের সুষ্ঠুতার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এসেছে এগুলো সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা। বলে দেয়া হয়েছে সুসম্পর্কের নীতিমালা আর শুভ পরিণতির কথা। বলে দেয়া হয়েছে কুসম্পর্কের অশুভ পরিণতির কথা।

● মানুষে মানুষে মানবিক সম্পর্ক

এখানে আমরা কেবল মানবিক সম্পর্কের দিকটি নিয়েই আলোচনা করবো। তিনটি বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। ইসলামী কালচারে মানুষ হিসেবে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই, কোনো বৈষম্য নেই। বংশ বর্ণ ও শ্রেণীগত কোনো ভেদাভেদ নেই। কেউ উঁচু নয়, কেউ নিচু নয়। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। কেউ দাস নয়, কেউ প্রভু নয়। কেউ পবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মানুষ হিসেবে সব মানুষ সমান। মানুষ হিসেবে সব মানুষের সৃষ্টিসূত্র এক, অভিন্ন। কুরআনে মানুষকে 'আদম সন্তান' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে ঃ

> "আমি তোমাদের একজন পুরুষ [আদম] আর একজন নারী [হাওয়া] থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত করেছি, যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনতে জানতে পারো।" [৪৯ ঃ ১৩]

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও দেখা যায়, সমস্ত মানুষ একই উপাদানের সৃষ্টি, একই প্রক্রিয়ায় সবাই সৃষ্ট এবং সমস্ত মানুষের অংগ প্রত্যংগ একই পক্রিয়ায় কর্মতৎপর। একই প্রক্রিয়ায় সবাই জীবন ধারণ করে, বেড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধ বয়সে জীবনী শক্তি হারায়। সব মানুষই শৈশবে জ্ঞানহীন থাকে, আবার অতি বার্ধ্যকে উপনীত হলে জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এসব কিছুই প্রমাণ করে, সমস্ত মানুষ আসলে এক ব্যক্তির সন্তান। মাটি থেকেই সব মানুষের সৃষ্টি। সব মানুষের শরীর একই উপাদানে গঠিত এবং সকলেরই সৃষ্টিগত সবকিছু সমান। সুতরাং জন্মগতভাবে সব মানুষ সমান। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে জন্মসূত্রগত এক চিরন্তন শাশ্বত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বৈষম্যহীন। এ সম্পর্ক মানবিক সম্পর্ক, মনুষত্বের সম্পর্ক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক।

● মানুষের জন্যে মানুষের বোধ

মানুষে মানুষে এই যে জন্মগত ও প্রাকৃতিক মানবিক সম্পর্ক, এ সম্পর্কের কারণেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় মানবতাবোধ। এ বোধ জন্মগতভাবেই মানুষের

মধ্যে থাকে। অতপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তা হয়তো বিকশিত হয়, নয়তো চাপা পড়ে যায়।

সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্যে মানুষের একটা বোধ অন্তর্গত করে দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যেমন বিবেকবোধ দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন সীমালংঘনের প্রবণতা। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন, সে যেনো তার বিবেকবোধকে চাংগা করে এবং পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত করে তোলে। অপরদিকে এ উপদেশও দিয়েছেন, সে যেনো তার সীমালংঘনের প্রবণতাকে সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে।

মানবতাবোধ একটি নৈতিক বোধ হলেও ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের কতিপয় অধিকার এবং কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সেগুলোর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছে। সেগুলোর লংঘনকে আইনগত ও শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। যেমন জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার। কর্ম, উপার্জন ও জীবিকার অধিকার। শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অধিকার। ভ্রমণ, বিয়েশাদী, সন্তান লালন পালন ও সামাজিক সম্পর্কের অধিকার প্রভৃতি। এসব অধিকার প্রদান করা ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও নৈতিকবোধ থেকেই উৎসারিত হয় এবং হওয়া কর্তব্য, ঠিক তেমনি ইসলাম এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগত ভাবেও বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে।

আইনগত দিকের আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্যে নয়। মানুষের মধ্যে বোধ সৃষ্টি হবার বিষয়টিই আমরা এখানে আলোচনা করছি। ইসলামী সংস্কৃতিতে নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই মানুষের প্রতি মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়। তাইতো ইসলামী সমাজে নেমে আসে শান্তি ও সুখের সুবাস।

● মানবতাবোধ সৃষ্টি

আপনি যখন কারো কাছে কোনো করুণ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায়, তার মন দরদে ভরে উঠে, তার হৃদয় করুণাসিক্ত হয়, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। এর অর্থ তার মধ্যে একটা বোধ ও চেতনা

সৃষ্টি হয়েছে। তার বিবেক চাংগা হয়ে উঠেছে, সে সহানুভূতিশীল হয়েছে। মানুষের উপকারে, মানবতার কল্যাণে সক্রিয় হতে তার বিবেক তাকে তাড়া করছে। ঠিক তেমনি, আপনি যদি কোনো পথিককে বলেন, সম্মুখে অগ্রসর হলে সে ভয়ংকর দূরাবস্থার সম্মুখীন হবে, তাহলে তার মধ্যে অবশ্যি পথ পরিবর্তনের চেতনা সৃষ্টি হবে। আপনি যদি কাউকে এ সুসংবাদ দেন যে, এ কাজটি যদি এভাবে সুসম্পন্ন করো, তবে তোমার জন্যে এই এই বিরাট পুরস্কার রয়েছে, তখন দেখবেন, ঐ কাজটি করার জন্যে সে উদ্বুদ্ধ হবে এবং সক্রিয় হয়ে উঠবে। কোনো দুর্দন্ড ক্ষমতাবান শাসক যদি ঘোষণা করে, অমুক কাজ যে করবে, তার জন্যে এই এই কঠিন শাস্তি রয়েছে, তখন মানুষ সে কাজের ব্যাপারে সর্তক হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে সক্রিয় হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক।

ইসলামী কালচারের প্রক্রিয়াও এটাই। এখানে ভালো কাজ, কল্যাণমূলক কাজ এবং সেবামূলক কাজের জন্যে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। মন্দ কাজের জন্য, মানুষের অধিকার ক্ষুন্নের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়। উদ্বুদ্ধ করা ও সতর্ক করার কাজে মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ প্রদান করা হয়। অতীতের লোকদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়। মানবতাবোধ সৃষ্টিতে ইসলাম এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী কালচার মানবতাবোধের কালচার।

● ইসলাম মানবতার ধর্ম

ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম। ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। এর গোটা ব্যবস্থাই মানুষের কল্যাণের জন্যে। নবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে দীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

> "এটা আমি এ জন্য পাঠিয়েছি যেনো মানুষ তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে ও মানব সমাজ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। [সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫]

অন্যত্র মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

> "তোমরা সর্বোত্তম দল, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণার্থে। তোমরা কল্যাণকর কাজের আদেশ করবে আর অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আদ দীনু আন নসীহা-দীন ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামনা।"

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভংগিকেই মানব কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটাই হয় প্রকৃত মানবতাবোধ। এর সাথে কোনো বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকেনা। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মাঝে এ নিঃস্বার্থ মানতাবোধ সৃষ্টিতেই সদা সক্রিয়। এ প্রসংগে আল কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু বাণী এখানে পেশ করতে চাই। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

১. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা। [বনি ইসরাঈলঃ২৩]
২. মা বাবার প্রতি দয়াশীল হও। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৩]
৩. নিকটাত্মীয়দের অধিকার দিয়ে দাও। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৬]
৪. দরিদ্রদের অধিকার দিয়ে দাও। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৬]
৫. ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। [সূরা হিজর ঃ ১৯]
৬. বিপদগ্রস্ত পথিকদের প্রতি দয়াশীল হও। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৬]
৭. মানুষের প্রতি দয়া করো, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেছেন। [সূরা কাসাস ঃ ৫৫]
৮. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩১]
৯. বৈধ অধিকার লাভ করা ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করোনা। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৩]
১০. ইয়াতীমের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে তার কাছেও যেয়োনা। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৪]
১১. ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করে দাও, কম দিওনা। [বনি ইসরাঈল ঃ ৩৫]
১২. হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে খাও, অপবিত্র জিনিস খেয়োনা। [সূরা আলবাকারা ঃ ১৭২]
১৩. কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো কল্যাণ নেই। প্রকৃত কল্যাণের কাজ তো সে ব্যক্তি করলো, যে ঈমান আনলো আল্লাহ্র প্রতি........আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অর্থসম্পদ দান করলো আত্মীয় স্বজনকে, ইয়াতীমকে, দরিদ্রকে, নিঃস্ব পথিককে দানপ্রার্থীকে, মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার কাজে এবং সালাত কায়েম করলো, যাকাত প্রদান করলো, অংগীকার পূরণ করলো, বিপদে অনটনে ও সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব সংগ্রামে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করলো। এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এবং আল্লাহ্ভীরু বিবেকবান লোক [সূরা আলবাকারা ঃ ১৭৭]

১৪. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ হরণ করোনা। [সূরা আলবাকারা ঃ ১৮৮]

১৫. গর্ভধারিনীরা পূর্ণ দু'বছর তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। [সূরা আলবাকারা ঃ ২৩৩]

১৬. হে বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদের যেসব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে দান করো, ঐ দিনটি আসার আগেই যেদিন কোনো বিকি কিনি থাকবেনা, বন্ধুতা কাজে আসবেনা এবং সুপারিশ করতে কেউ এগিয়ে আসবেনা। [সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪]

১৭. যারা আল্লাহ্র পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তাদের এ দানের উপমা হলো বীজের মতো। যেনো একটি বীজ বপন করা হলো। তা থেকে বেরুলো সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষে জন্ম নিলো শত বীজ। যাকে চান আল্লাহ্ অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। তিনি সীমাহীন উদার মহাজ্ঞানী। [সূরা আলবাকারা ঃ ২৬১]

১৮. দান করে কষ্ট দেয়ার চাইতে, দান না করে সুন্দর কথা ও ক্ষমা অনেক উত্তম। [সূরা আলবাকারা ঃ ১৬৩]

১৯. তোমরা জনকল্যাণে যে ব্যয় করো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। [সূরা আলবাকারা ঃ ২৭২]

২০. ওরা বলে, ব্যবসাতো সুদী কারবারের মতোই। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ। [সূরা আলবাকারা ঃ ২৭৫]

২১. আর সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি কষ্টের মধ্যে থাকে তবে তাকে অবকাশ দাও। আর যদি দান করে দাও, তবে তাতে রয়েছে সর্বাধিক কল্যাণ। [সূরা আলবাকারা ঃ ৮০]

২২. যার কাছে আমানত রাখা হয়, সে যেনো আমানত ফেরত দেয় এবং যেনো তার প্রভু আল্লাহ্কে ভয় করে। [সূরা আলবাকারা ঃ ২৮০]

২৩. তোমরা উৎকৃষ্ট সম্পদের সাথে নিকৃষ্ট সম্পদ বদল করোনা। [সূরা আননিসা ঃ ২]

২৪. তোমরা সন্তুষ্টির সাথে স্ত্রীদের মোহর দিয়ে দাও। [সূরা আননিসা ঃ ৪]

২৫. বাবা ও আত্মীয় স্বজন যে অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও। [সূরা আননিসা ঃ ৭]

২৬. তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন সুবিচার করো। [সূরা আননিসা ঃ ৫৮]

২৭. বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে ওকালতি করোনা। [সূরা আননিসা ঃ ১০৫]

২৮. হে বিশ্বাসীরা, সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। [সূরা আননিসা ঃ ১৩৫]

২৯. তোমরা কল্যাণকর ও বিবেকসম্মত কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা। (সূরা আল মায়িদা ঃ ২)

৩০. তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হলো মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত্‌....। [সূরা আল মায়িদা ঃ ৩]

৩১. হে বিশ্বাসীরা! মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর নিক্ষেপ এগুলো নোংরা শয়তানি কাজ, সুতরাং এসব কাজ থেকে বিরত থাকো। [সূরা আল মায়িদা ঃ ৯০]

৩২. আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদের পছন্দ করেননা। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০]

৩৩. আল্লাহ্‌ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেননা। [সূরা বাকারা ঃ ১৯০]

৩৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা কর্তৃত্ব লাভ করলে, তাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করে বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংসের কাজে। আল্লাহ্‌ এসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোটেও পছন্দ করেননা। [সূরা আলবাকারা ঃ ২০৫]

৩৫. যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্‌ সেসব উপকারীদের পছন্দ করে। [সূরা আলবাকারাঃ ২০৫]

৩৬. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ধিক্কার দিয়ে বেড়ায়। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪]

৩৭. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে অর্থ সম্পদ পুঞ্জিভূত করে এবং গুণে গুণে রেখে দেয়। [সূরা আল হুমাযা ঃ ২]

৩৮. সেই দুর্গম পথটি হলো মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, অনাহারের দিনে কোনো নিকটের ইয়াতীমকে কিংবা ধূলো মলিন দরিদ্রকে খাবার খাওয়ানো আর সেসব লোকদের সাথি হওয়া যারা ঈমানের পথে এসেছে, পরস্পরকে ধৈর্য ধরার ও সৃষ্টির প্রতি দয়া করার উপদেশ দিচ্ছে। এরাই হবে ডান পাশের লোক। [তাওবা ঃ ১৩-১৮]

৩৯. ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়োনা এবং সাহায্য প্রার্থীকে ধমক দিয়োনা। [সূরা আদ্‌দুহা-১০]

৪০. যদি সৌজন্য দেখাও, যদি এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ও ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। [সূরা তাগাবুন ঃ ১৪]

৪১. আমার দাসদের বলে দাও! তারা যেনো এমন কথা বলে, যা সুন্দর, চমৎকার ও কল্যাণময়। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৫৩]

৪২. স্ত্রীদের সাথে তোমরা সুন্দর চমৎকার আচরণ করো। [নিসা ঃ ১৯]

৪৩. হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সরল সঠিক ও ন্যায়সংগত কথা বলো। [সূরা আহযাব ৭০]

এই হলো আল কুরআনের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতির সরণি। মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণী আল কুরআন তো মানুষের জন্যেই নাযিল করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এ কুরআন তিনি মানুষের পথ প্রদর্শক, মানুষের জন্যে রহমত, আলোকবর্তিকা, উদ্ধারকারী এবং মুক্তিদাতা হিসেবে পাঠিয়েছেন। নবীদের কিতাব নিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো তাঁরা এর ভিত্তিতে মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। তাই মানব দরদ ও মানবতাবোধ সম্পন্ন সংস্কৃতির সূতিকাগার হবেতো এ কিতাবই। মানবতাবোধ শিখতে ও জানতে হলে এবং সত্যিকার মানব দরদী এবং মানবাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এ কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মানব কল্যাণমুখী সংস্কৃতি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। আল কুরআনের বাহক মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর বাণী হাদীস মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। গোটা হাদীস ভান্ডারে ছড়িয়ে রয়েছে মানবতাবোধের প্রতি মর্মস্পর্শী আহ্বান। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। এ থেকেই জানা যাবে কুরআনের মতোই হাদীসেও মানবতাবোধের সংস্কৃতির প্রতি কতটা প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ

১. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ সে, যার আচার ব্যবহার সবচেয়ে ভালো। [সহীহ্ বুখারি]

২. পূর্ণ মুমিন তারা, যাদের আচার আচরণ সর্বোত্তম। [মিশকাত]

৩. যে তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভংগ করোনা। [তিরমিযি]

৪. দান হচ্ছে [মুক্তি লাভের] একটি প্রমাণ। [সহীহ্ মুসলিম]

৫. দান সম্পদ কমায়না। [তিবরানি]

৬. যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মানুষের সাথে উত্তম কথা বলে। [বুখারি]

৭. যে প্রতারণা করলো সে আমার লোক নয়। [মুসলিম]
৮. শিশুরা আল্লাহর ফুল [তিরমিযি]
৯. রোগীর সেবা করো এবং ক্ষুধার্তকে খেতে দাও। [সহীহ বুখারি]
১০. আল্লাহ্ সকলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছেন। [মুসলিম]
১১. যে অপরের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। [সহীহ্ বুখারি]
১২. অপর ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করোনা। [তিরমিযি]
১৩. যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেননা। [বুখারি]
১৪. সে মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, আর পাশেই তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে। [বায়হাকি]
১৫. অধীনস্থদের সাথে নিকৃষ্ট আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। [মুসনাদে আহমদ]
১৬. নেতা হবে জনগণের সেবক। [দায়লমি]
১৭. গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবারের জন্যে বেশি উপকারী, সে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। [সহীহ্ মুসলিম]
১৮. যে ব্যক্তি ওয়ারিশকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। [ইবনে মাজাহ]

মানবতার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকেই আমরা ইসলামের দৃষ্টিভংগি জানতে পারলাম। এই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। কুরআন হাদীসের উপরোক্ত বাণীগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম ঃ

১. মানবতাবোধ ঈমানের সাথে জড়িত।
২. মানব কল্যাণ ঈমানের অপরিহার্য দাবি।
৩. মানবতাবোধ শ্রেষ্ঠ ঈমানি গুণ।
৪. এ গুণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয়না।
৫. এ গুণের অধিকারী আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র।
৬. এ গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট ঘৃণিত।
৭. এ গুণের অধিকারী মুমিনের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।
৮. মানবতাবোধ ও মানবকল্যাণ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ।

৯. মানবতাবোধ মানে মানুষের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতিশীল হওয়া।
১০. মানবতাবোধ মানে মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা।
১১. ইসলাম মানবতার ধর্ম।
১২. ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মানব কল্যাণমুখী সংস্কৃতি।

যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চান, যিনি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় হতে চান, যিনি মানুষের প্রিয় হতে চান, যিনি জান্নাতের অধিকারী হতে চান, তাঁর উচিত মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া, মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন করা। তাঁর উচিত মানবদরদী হওয়া এবং মানুষকে নিজের মতো আপন করে নেয়া। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বার বার মনে পড়ে। তিনি বলেছেন ঃ

"অনুগ্রহশীল দাতা আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী মানুষের অতি কাছাকাছি এবং জান্নাতের দ্বার প্রান্তে উপনীত।"

তাই মানবতাবোধের এই সংস্কৃতি ও কালচারের প্রবর্তনই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

ঘ. সৌন্দর্যবোধ

ইসলাম এক অনুপম আদর্শ সংস্কৃতি। তাওহীদি ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি। আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ। মানবতাবোধ এর প্রতিদিষ্ট প্রত্যাদেশ। ইসলামী সংস্কৃতির এই অন্তর্গত সৌন্দর্যই তার ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রবর্তক।

পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের পর শিল্প কারখানা এবং শিল্প কলা সর্বক্ষেত্র থেকেই মানবিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দর্শন তাদের জীবন ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো অস্‌কার ওয়াইল্ডের ঘোষণা Art for Art sake.

কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী দর্শনে এক মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সে প্রতি মুহূর্তে সচেতন ও সক্রিয়। তার জীবনের একটি মুহূর্তও লক্ষ্য বিবর্জিত থাকেনা। ক্ষুদ্র থেকে বড় কোনো কাজই তার লক্ষ্যচ্যুত নয়। জীবনের সকল বিষয়ের মতো শিল্প কলার ক্ষেত্রেও সে লক্ষ্যহীন নয়। আদর্শচ্যুত নয়। মানব কল্যাণ, মানবতাবোধ এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের সুতীব্র অনুভূতিতে সে সদা সক্রিয়।

মুমিনের সকল কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রতিবিম্বিত। সর্বত্রই সে তার মহামনিবের ইচ্ছা কার্যকর করে। সর্ব সময় সে আল্লাহ্‌মুখী থাকে। রসূলের আদর্শ থেকে সে কখনো বিচ্যুত হয়না। আখিরাতের মুক্তি চেতনা কখনো তার বিবেককে শিথিল করেনা। ফলে Art for Art sake কথাটি তার কাছে একটি বাহুল্য বচন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সর্বপ্রকার আর্ট সৃষ্টি নিবেদিত হয় আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে। তার আর্টের উদ্বোধক হয় পরকালীন মুক্তির চিন্তা। তার সমস্ত আর্টের মূলনীতির উৎস হয় রসূলের আদর্শ। সুতরাং মুমিনের সমস্ত আর্ট আদর্শ ভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কেন্দ্রিক।

মূলত, যারা আল্লাহ্‌র পরিচয় জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলের মাধ্যমে তিনি জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন সেটাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সমাজের বুকে সে বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে, তারাই আদর্শ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের পবিত্র কালচার ও জীবন সৌন্দর্যের জ্যোতিতেই সমাজ আলোকিত হয়। তারা সমাজের মণিমুক্তা। তাদের জীবন সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হয় আল্লাহ্‌র দীনের আদর্শ। ইসলামী জীবন প্রণালী, রীতি নীতি, আদব কায়দা ও আচার আচরণের তারা হয় মূর্ত প্রতীক। তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, কর্মপন্থা ও কর্মনীতি বিমুগ্ধ করে তোলে সমাজকে। তাদের অনাবিল সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবন ধারা মানুষকে আকৃষ্ট করে আল্লাহ্‌র পথে। ইসলামের সৌন্দর্য বোধ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌মুখী।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।" আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যে জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন, তার চাইতে সুন্দর আর কোনো বিধান হতে পারেনা। আল্লাহ্‌ সুন্দর। তাঁর প্রদত্ত বিধানও সুন্দর। এই সুন্দরতম বিধান মুমিনরা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তোলে। তাই তারা মানুষের মাঝে সুন্দরতম মানুষ। তাদের জীবন সুন্দর জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন, মহত জীবন, আদর্শ জীবন, উন্নত জীবন। তাদের জীবন সৌন্দর্য মানব সমাজকে সৌন্দর্য দান করে।

মুমিনের বাস্তব জীবন হয়ে থাকে ইসলামের বাস্তব সাক্ষ্য। ইসলামের সমস্ত সুন্দর গুণবৈশিষ্ট ফুলের মতো ফুটে উঠে তার চরিত্রে। তার সমস্ত কর্মে। তার আদর্শ কালচার ও জীবন ধারা থেকে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যকে জেনে বুঝে নেয়। এ জন্যেই আল্লাহ্‌ মুসলিম উম্মাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্‌ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির কাছে সাক্ষ্য হও।"

সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আদর্শেরই সাক্ষ্যবহ। ফলে ইসলামের সমস্ত কাজের পেছনেই সক্রিয় থাকে এক পূত অনাবিল সৌন্দর্যবোধ। এই সৌন্দর্যবোধ মুমিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

● মনের সৌন্দর্য

মানুষ যখন কোনো কাজ করে, তখন প্রথমে মন মস্তিষ্ক সে বিষয়ে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর অংগ প্রত্যংগ তা বাস্তবায়ন করে। মন যদি সুন্দর চিন্তা করে, তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর কাজ করে। মন যদি কুচিন্তা করে , অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অঙ্গ প্রত্যংগ তাই বাস্তবায়ন করে। মনের কাজই চিন্তা করা। সে চিন্তা মুক্ত থাকেনা। তাকে সুচিন্তার খোরাক না দিলে সে কুচিন্তা করবেই। মুমিন সব সময় মনের পিছে লেগে থাকে। তাকে সুচিন্তার উপকরণ সরবরাহ করতে থাকে। মুমিনের মনের সৌন্দর্য হলো, মুমিন সব সময় ঃ

১. আল্লাহ্‌র প্রেমে মনকে পাগল করে রাখে।

২. আল্লাহ্‌র স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখে।

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে।

৪. পরকালের জবাবদিহির চিন্তা তার মনকে ব্যাকুল করে রাখে।

৫. ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের চিন্তা মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

৬. সব মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের চিন্তা করে। কারো অকল্যাণের চিন্তা করেনা। মানুষকে ভালবাসে।

৭. ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে সে মনকে মুক্ত রাখে।

৮. কুচিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখে।

৯. সন্দেহ, সংশয় ও কুধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখে।

১০. বৈষয়িক লোভ লালসা ও কামনা বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখে।

১১. আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় তার মনকে আচ্ছন্ন রাখে।

১২. তার মনের মধ্যে থাকে জ্ঞানার্জনের অদম্য পিপাসা।

● কথার সৌন্দর্য

মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলে। তার কথাবার্তার সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। সে–

১. সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করে।

২. হাসিমুখে কথা বলে। মুসকি হাসে, অট্টহাসি নয়।

৩. সুন্দর ও কোমলভাবে কথা বলে। চিৎকার করে কথা বলেনা। কর্কশ ভাষায় কথা বলেনা। বিনীতভাবে কথা বলে।

৪. সম্মান প্রদর্শন করে কথাবার্তা বলে।

৫. সোজাসুজি কথা বলে। বাঁকা কথা বলেনা।

৬. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অন্যের কথা শুনে।

৭. অপরের কথা শেষ হবার আগে কথা বলেনা।

৮. যিনি বলতে চান তাকে তার সম্পূর্ণ কথা বলতে দেয়।

৯. কথাবার্তায় শ্রোতার মনে কষ্ট দেয়না।

১০. এক জনের দোষ অপরজনের কাছে বলেনা। এমনকি তা যদি সত্যও হয়। কারণ তা গীবত।

১১. কথাবার্তা বলার সময় বিতর্ক পরিহার করে। কেউ বিতর্ক করতে চাইলে সে কথা শেষ করে দেয়।

১২. বেশি শুনে, কম বলে।

১৩. অর্থবহ কথা বলে। বাজে ও নিরর্থক কথা বলেনা।

১৪. কথাবার্তায় মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করেনা। আশান্বিত করে। সহজতা বিধান করে।

১৫. সুবিচারমূলক কথা বলে। অন্যায় বলেনা। সত্য বলে। মিথ্যা বানোয়াট কথা বলেনা।

১৬. তার কথা হয়ে থাকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক।

১৭. শ্রোতার জন্যে সে দোয়া করে। তার কল্যাণ কামনা করে।

● দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য

দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য হয়ে থাকে মুমিনের নিত্যসংগি। একজন মুমিন–

১. পায়খানায় গেলে ভালভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়। ঢিলা বা টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করে। হাত পরিষ্কার করে ধুইয়ে নেয়।

২. প্রশ্রাবের পর ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করে। প্রয়োজণীয় সময় ক্ষেপণ করে উত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়।

৩. গোসল আবশ্যক হলে দেরি না করে উত্তমরূপে গোসল করে নেয়। শুক্রবারে অবশ্যি গোসল করে।

৪. পরিধেয় পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

৫. নখ বড় হতে দেয়না। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কেটে নেয়।

৬. চুল ছোট ও পরিচ্ছন্ন রাখে। চুল আচঁড়ে রাখে।

৭. কান, নাক পরিষ্কার রাখে।

৮. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেনা।

৯. শরীর সুস্থ রাখে। প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করে। অসুখ হলে চিকিৎসা করে।

১০, সে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সবকিছু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে।

১১. তার পরিবেশকে সে সুন্দর করে গড়ে তোলে। সুসজ্জিত করে তোলে।

প্রিয় নবী বলেছেন ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"

কুরআন বলে ঃ "আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।"

● পানাহারের সৌন্দর্য

মুমিনের আরেকটি অনন্য সৌন্দর্য হলো তার পানাহারের সৌন্দর্য। মুমিন ব্যক্তি–

১. সব সময় হালাল খাদ্য গ্রহণ করে। হারাম পরিত্যাগ করে।

২. আল্লাহ্র নাম নিয়ে খাবার শুরু করে। [বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ্]।

৩. পানাহার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে।

৪. বসে পানাহার করে। দাঁড়িয়ে বা হেলান দিয়ে পানাহার করেনা।

৫. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে।

৬. ডান হাতে আহার করে।

৭. একই পাত্রে বা অন্যদের সাথে খেতে বসলে নিজের নিকটেরটা খায়। নিজে যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করে।

৮. সে মেহমানদারি করে। মেহমানের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

৯. মেহমান এলে প্রয়োজনে একজনের খাদ্য দু'জনে খায়, কিংবা মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়।

১০. খাবার জিনিসের অপব্যয় করেনা। অপচয় করেনা।

১১. হাত পরিষ্কার করে ধুইয়ে খাবার শুরু করে। খাবার শেষ হলেও পরিষ্কার করে হাত ধুইয়ে নেয়।

১২. ধীরে সুস্থে খায়।

১৩. মুখে খাবার রেখে কথা বলেনা।

১৪. অনেকে একত্রে খেতে বসলে একসাথে খাবার শুরু করে।

১৫. হাড়, কাঁটা ইত্যাদি যা কিছু ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলেনা। খাবার জায়গা অপরিচ্ছন্ন করেনা।

১৬. পঁচা অপরিচ্ছন্ন খাবার খায়না।

১৭. সুষম খাদ্য গ্রহণ করে।

● সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য

মুমিনের সৌন্দর্যবোধ তার ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক জীবনের সর্বাংগ পরিব্যাপ্ত। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে ইসলামের কালচারে জ্যোতির্ময় করা মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম একজন মুমিনের উপর অগণিত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। সেই কর্তব্য কাজগুলিই মুমিন জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ। মুমিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সৌন্দর্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে। মুমিনদের কতিপয় মৌলিক সামাজিক সৌন্দর্য হলো ঃ

১. বিশ্বস্ততা।

২. সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা।

৩. মানুষের কল্যাণ কামনা।

৪. মানব সেবা ও পরোপকার ।

৫. দয়া ও ক্ষমা।

৬. আত্মত্যাগ।

৭. সম্মান প্রদান ও স্নেহ পরায়ণতা।

৮. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা, পরমত সহিষ্ণুতা।

৯. সাহায্য, সহযোগিতা, উদারতা, অমায়িকতা ও দানশীলতা।

১০. পরামর্শ দান ও গ্রহণ ।

১১. পরস্পরের দুঃখ সুখে শরীক হওয়া।

১২. রোগগ্রস্তকে দেখা শুনা করা, সেবা করা।

১৩. সালাম আদান প্রদান করা।

১৪. ঐক্য, একতা ও সংঘবদ্ধতা।

১৫. সত্য ও ন্যায়ের প্রচার প্রতিষ্ঠা।

১৬. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ।

১৭. শিক্ষা দান, শিক্ষা গ্রহণ।

১৮. মেহমানদারি।

১৯. বিবাহশাদী, আত্মীয়তা, পারিবারিক জীবন যাপন।

২০. লেনদেন, ধার করজা প্রদান।

২১. সদাচার, শিষ্টাচার ও আদব কায়দা।

২২. বন্ধুতা ভালবাসা।

২৩. মসজিদে সালাত আদায়।

২৪. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা।

২৫. সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ।

এখানে মাত্র সামান্য কয়েকটি দিকই আমরা আলোচনা করলাম। মূলত মুমিনের সমস্ত কাজই সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই মুমিনকে সৌন্দর্য ধারণ করতে বলেছেন ঃ

১. হে নবী বলো ঃ আল্লাহ্ তার বান্দাহ্দের জন্যে যেসব সৌন্দর্য ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কে তাদের জন্যে হারাম করলো? [আল কুরআন ৭ ঃ ৩২]

২. পৃথিবীতে যা কিছু সাজ সরঞ্জাম আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি। [সূরা আ'রাফ ঃ ৭]

৩. সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। [সূরা কাহফ ঃ ৪৬]

৪. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ করো। [সূরা আ'রাফ ঃ ৩১]

৪

ইসলামের ইন্দ্রিয় সংস্কৃতি

ইন্দ্রিয় কালচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কালচার। মানুষ কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। এই ইন্দ্রিয়গুলোর চর্চা মানুষ কিভাবে করছে, তার ভিত্তিতেই নির্ণীত হয় তার কালচার। আর কোনো কিছুর চর্চার কথা যখনই আসে, তখন তার সাথে একটি অনিবার্য কথা যুক্ত থাকে। সেটা হলো ব্যক্তির বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি। মানুষ যা কিছু চর্চা করে তার উদ্দীপক শক্তি হলো তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি। সে যে আচরণই করে তা করে তার বিশ্বাস আর দৃষ্টিভংগির প্রেক্ষিতেই।

এখানে এসেই সৃষ্টি হয় মানুষের কালচারের ভিন্নতা। অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির ভিন্নতা। দৃষ্টিভংগি ও ধ্যানধারণার বৈপরিত্যই বিভাজন করে কালচারকে। এ ভিন্নতা ও বিভাজন থেকেই জন্ম নেয় আলাদা আলাদা সভ্যতা।

তওহীদি ঈমান আর জড়বাদী বিশ্বাস দু'টি ভিন্ন বরং বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি করে। দৃষ্টিভংগির এ বৈপরিত্য মুমিন আর জড়বাদীর সভ্যতা সংস্কৃতিকে আলাদা করে দেয়। তওহীদি ঈমান নিরেট এক আল্লাহ্‌মুখী মন সৃষ্টি করে। তাতে বস্তুবাদ ও তার বংশধর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, বৈরাগ্যবাদ ইত্যাদির কোনো স্থান নেই। ঈমানের সাথে এদের রয়েছে চিরন্তন সংঘাত, শত্রুতা। তাই একই মনে ঈমান আর তার শত্রুরা একত্র হতে পারেনা।

জড়বাদে বিশ্বাসীদের সংস্কৃতি লাগামহীন। এর কারণ তাদের দৃষ্টিভংগির লাগামহীনতা।

অপরদিকে মুমিনদের সাংস্কৃতিক ঐক্য বিশ্বজনীন ও শাশ্বত। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাদের যে সংস্কার সংস্কৃতি তার মূল উদ্দীপক শক্তি তাদের একক বিশ্বাস, অভিন্ন দৃষ্টিভংগি এবং অদ্বিতীয় ধ্যানধারণা।

মুমিনের মন লাগামহীন ঘোড়ার মতো তাকে নিয়ে যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়না। বরং তার মন তার আদর্শ ও আদর্শিক বিশ্বাস দ্বারা সংস্কৃত। তার মন সুস্থ প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মন তাকে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রেরণা যোগায়। খোদায়ী গুণাবলীতে গুণান্বিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। সৃষ্টিকূলের সেবা করতে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে উজ্জীবিত করে।

মুমিনের মন চায় মানুষের কল্যাণ, কখনো চায়না কারো অকল্যাণ। তার মন সবসময় সুচিন্তা করে। কুচিন্তাকে সে ঠেলে দেয় দূরে। তার মন শুভাকাংখায় সিদ্ধ। অশুভ কামনা সে করেনা কারো। তার মন আকাশের মতো উদার। সংকীর্ণতা সেখানে পায়না কোনো ঠাঁই।

পাপ মন্দ ও অন্যায় কাজে তার মন অনুতপ্ত হয়। ভালো কাজে তার মন খুশিতে আপ্লুত হয় মহান প্রভুর সম্মুখে।

বিজয় ও সাফল্যে তার মন খুশিতে আত্মহারা হয়না, বিনীত হয়। বিপদ মুসীবতে তার মন ভেংগে পড়েনা, শান্তধীর সত্তার মতোন থাকে সুদৃঢ় অটল। নিরাশা নাগাল পায়না তার। সে থাকে সদা আশান্বিত। তবে সতর্কতা একান্ত সাথি হয়ে থাকে তার সব সময়।

গোটা সৃষ্টি আর সৃষ্টির অণু পরমাণুতে সে অনুভব করে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ও কর্তৃত্বের সীমাহীন নিদর্শন।

তার মন সবকিছু থেকে সুশিক্ষা লাভ করে। কুশিক্ষা সে করে পরিহার।

তার মনের মধ্যে আছে মনচক্ষু। আছে বুঝ আর বোধশক্তি। চর্মচোখ যা দেখেনা, তার মনচোখ এমন অনেক কিছুই দেখতে পায়। আর যা কিছুই সে দেখে সে সম্পর্কে একটা সঠিক বুঝ তার মধ্যে জন্ম নেয়।

তার মনের আছে সিদ্ধান্ত শক্তি। সে যা কিছু দেখে, যা কিছু বুঝে, তার ভালোমন্দ হওয়া সম্পর্কে সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার মধ্যে আছে একটি সচেতন বিবেক। এ সিদ্ধান্ত সে বিবেককে জানিয়ে দেয় অবিলম্বে। সাথে সাথে মন্দটিকে ঘৃণা করতে বলে। স্বাগত জানাতে বলে ভালকে। তার পরখ শক্তি তীক্ষ্ণ। সে দেখা মাত্র পরখ করে নিতে পারে সত্য আর মিথ্যাকে, হক আর বাতিলকে।

জৈবিক কামনা বাসনা, লোভ লালসা তাকে পরাস্ত করতে পারেনা। বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে পারেনা হক পথ থেকে, সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে। কারণ তার সতর্ক ও তীক্ষ্ণধার বিবেক কখনো বরদাশ্‌ত করেনা কোনো মন্দকে, মেনে নেয়না কোনো অন্যায়কে। কখনো কোনো পদস্খলন হয়ে গেলে প্রভুর অসন্তুষ্টির অনুভূতি তাকে দহন করে লেলিহান শিখার মতো, দংশন করে বিষাক্ত গোখরার মতো। কখনো এমনটি হয়ে গেলে প্রচন্ড অনুতাপ অনুশোচনায় বিনীত হয় সে

প্রভুর দরবারে, অশ্রুসিক্ত কাতর প্রার্থনা নিয়ে হাযির হয় তাঁর সন্তুষ্টির কামনায়। ফিরে আসে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে।

এভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি আর পদস্খলন হয়ে গেলে সে আরো সচেতন হয়, আরো সতর্ক হয়। জৈবিক কামনা বাসনা ও লোভ লালসাকে পরাভূত করার কাজে আরো সুদক্ষ হয়ে উঠে। লাভ করে প্রচন্ড আত্মিক শক্তি। ফলে, একজন সত্যিকার মুমিনের গোটা ইন্দ্রিয় নিচয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌মুখী হয়ে পড়ে। তার যবান, চোখ, কান তথা গোটা দেহসত্ত্বা সত্য, ন্যায়, সুবিচার, সহানুভূতি, সেবা, সহযোগিতা, শুদ্ধতা, ভদ্রতা, পরিশীলতা ও সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়। কারণ সেতো জানে তার ইন্দ্রিয় আচরণের জন্যে তাকে তার প্রভুর কাছে জবাবদিহী করতে হবে ঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً،

"এমন কোনো পন্থার অনুসরণ করোনা যা সঠিক হবার ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই। কারণ শ্রুতি, দৃষ্টি এবং মন প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৬)

অপরদিকে সে হয় অন্যায়, অসত্য, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, রুক্ষতা, ক্রোধ, কৃপণতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, অসংযম, অশুদ্ধতা, অভদ্রতা, অনাচার, দূরাচার, পাপ, পংকিলতা, অশ্লীলতা ও অসুন্দরের আবিলতামুক্ত রকমারি ফুল ফলের সুনিবীড় সবুজ বনানীর মননশীল এক সম্মোহনী উদ্যানের মতো ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ، وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ، اُولٰٓئِكَ جَزَاۤءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ، (ال عمران)

"তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম পালন করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। এগিয়ে চলো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার পথে আর সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে। এটা সেই সব আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে যারা সচ্ছল অসচ্ছল সর্বাবস্থায়ই অর্থদান করে, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অপরের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়। এরূপ কল্যাণকামী লোকদের আল্লাহ্ অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর এরা সেসব লোক যারা কোনো অশ্লীল বা পাপ কাজ করে আত্মযুল্‌ম করে ফেললে সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করে, কারণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ মাফ করতে পারেন? -অতপর জেনে বুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের উপর আর দাঁড়িয়ে থাকেনা। এসব লোকের জন্যে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রতিদান রয়েছে ক্ষমা আর সেই জান্নাত যার ভূমিতে প্রবহমান রয়েছে ঝর্ণাধারা। সেখানে চিরকাল থাকবে তারা। সুকর্মে তৎপর লোকদের জন্যে কতইনা চমৎকার এ প্রতিদান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩২-১৩৬)

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ، وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ، (المائده : ٨٣-٨٤)

"যখন তারা রসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শুনে, দেখবে, সত্য উপলব্ধি করতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তারা বলে উঠে ঃ 'ওগো আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে আমাদের নামও লিখে নাও।' তারা আরো বলে ঃ কেন আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবোনা এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নেবোনা, যখন আমাদের পরম কামনা হলো আমাদের প্রভু যেনো আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৩-৮৪)

এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় নিচয় তার মন মস্তিষ্ক, শ্রবণশক্তি, চোখ ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি কী চমৎকারভাবে

তাকে শুদ্ধ, সংস্কার ও পবিত্র করে তোলে। অবিশ্বাসীরা শুদ্ধি, সংস্কার ও পবিত্রতার এ সুউচ্চ পর্যায়ের কথা কল্পনাই করতে পারেনা। একটি হাদীসে কুদসীতে আইডিয়াটি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْئٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبُّهٗ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطَشُ بِهَا وَرِجْلَه الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا، وَاِنْ سَأَلَنِىْ لَاَعْطَيْتُهٗ، وَلَئِنْ اِسْتَعَاذَنِى لَاُعِيْذَنَّهٗ، وَمَاتَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْئٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ عَبْدِى الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ، (صحيح البخارى : ابو هريره)

“যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় হলো, আমার দাসরা তাদের উপর আমার ফরয করা বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে। আর যখন তারা আমার নৈকট্য লাভের জন্যে নফলও আদায় করতে থাকে, তখন আমি তাদের ভালোবাসতে থাকি। আর আমি যখন কাউকেও ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যি তাকে দান করি। সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি অবশ্যি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করে ফেলি। কিন্তু আমার মুমিন দাসের জীবন সম্পর্কে কিছু করার ক্ষেত্রে আমার মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ আমি অপছন্দ করি তার জীবন সায়াহ্নকে।” (সহীহ বুখারি ঃ আবু হুরাইরা)

৫

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির সমস্যা ও সম্ভাবনা

ক. আগ্রাসনের শিকার ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি বাংলাদেশের এই ভৌগলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির মূল এখানকার সমাজ ব্যবস্থার সুগভীরে প্রোথিত এবং এ সংস্কৃতি এদেশের জন সমাজে শত শত বছর থেকে লালিত। বর্তমানে এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি যেমন আগ্রাসনের শিকার, তেমনি রয়েছে এর তীব্র প্রাবল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় নব্বই জন মানুষ মুসলমান। এদেশ মুসলমানদের দেশ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হয়েছিল ইসলামের কারণে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা। তারই পরিণতিতে একাত্তর সালে পাকিস্তান বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। ১৯৪৭ সালে ইসলাম আর ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দের ফলে যে ভারত বিভাগ হয়েছিল, মূলত তারই শেষ পরিণতিতে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করতে পেরেছি।

ইসলামকে যারা জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তারাই মুসলিম। বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনাদর্শ ইসলাম। ইসলামী ভাবধারা এবং জীবন বোধই এখানকার মুসলমানদের আদর্শ। ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্টসমূহই বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি এবং মন মানসিকতায় একাকার হয়ে আছে। কিন্তু আজ আমাদের সংস্কৃতি আগ্রাসনের শিকার। ইসলামের শত্রুরা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চতুর্মুখী যুদ্ধ শুরু করেছে।

আমাদের ঈমান আকীদা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের উপর বস্তুবাদী চিন্তাধারা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। জীবনের মহান লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। চরিত্র ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের সমাজে অশ্লীলতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী নগ্ন আদিরসের অবাধ আমদানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিকৃতিকে সুকৃতির আবরণ দিয়ে মাতিয়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের রীতিনীতি, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদিকে পদদলিত করা হচ্ছে। আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানকে আমাদের নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে। অশ্লীলতা, পংকিলতা, নীতিহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংস করা হচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হচ্ছে। মূলত এইসব হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকার সুযোগে।

যেসব মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, সেগুলো হলো ঃ

১. আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

২. নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা।

৩. টেলিভিশনের নগ্ন অপসংস্কৃতির প্রচার।

৪. বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষী ও বস্তুবাদী দর্শনের বাহক বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানি।

৫. আদর্শবোধ বিবর্জিত সিনেমা, নাটক, গান, যাত্রা ইত্যাদি।

৬. সহশিক্ষা।

৭. অশ্লীল, নৈতিকতা বিবর্জিত অডিও, ভিডিও। দেশী ও বিদেশী।

৮. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার অপচেষ্টা।

৯. সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ব্যক্তি ও জাতিপূজা।

১০. রাজনৈতিক অনাচার।

১১. আদর্শহীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

১২. N.G.O. -দের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা।

১৩. নারী ও শিশু শ্রম।

১৪. পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

খ. ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা

তবে বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির জাগরণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও জোরদার হয়েছে। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা জোরদার হয়েছে।

২. যুব সমাজের মাঝে ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

৩. ইসলামী বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা রচনা এবং প্রকাশনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. শিল্প সাহিত্যের অংগনে ইসলামী ভাবধারায় সংগঠন সংস্থা গড়ে উঠছে। অডিও, ভিডিও তৈরি শুরু হয়েছে।

৫. কিছু কিছু আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

৬. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে।

৭. ব্যাপকভাবে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ওয়ায মাহফিল হচ্ছে।

৮. রেডিও, টিভিতে আযান প্রচারিত হয়।

৯. নতুন নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদে মুসল্লি বাড়ছে।

১০. যুবতীদের মধ্যে হিজাব চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১. ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির পতাকাবাহীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। মানুষ ইসলামী আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ইসলামী চেতনা ও জীবনবোধ তীব্র হচ্ছে।

গ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে

তবে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার লক্ষ্যে আরো তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক কাজ জোরদার করা দরকার।

ইতিবাচক কাজগুলো হলো ঃ

১. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

২. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আরো ব্যাপকভাবে শিল্প ও সাহিত্য সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. ইসলামী জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক বই পুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলায় জেলায় ইসলামী বই মেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ইসলামী চেতনাধারী পত্রপত্রিকার প্রকাশনা প্রচুর বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. ইসলামী জীবনবোধকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক ভিডিও, অডিও তৈরি করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া দরকার।

৬. রেডিও এবং টেলিভিশনে ইসলামী সংস্কৃতির বাহক প্যাকেজ প্রোগ্রাম করতে হবে।

৭. ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন জোরদার করতে হবে। ব্যাপক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

নেতিবাচক যে কাজগুলো করা দরকার, সেগুলো করতে হবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। সেগুলো হলো বিরোধিতার কাজ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সৃষ্টির কাজ এবং নির্মূল করার কাজ। সে কাজগুলো করতে হবে ঃ

১. অশ্লীল পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও আমদানির বিরুদ্ধে।

২. ইসলাম বিরোধী ও অশ্লীল লেখক, লেখিকা, তাদের রচিত বই পুস্তক এবং প্রকাশকদের বিরুদ্ধে । অনুরূপ বই পুস্তক আমদানির বিরুদ্ধে।

৩. টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচারিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

৪. অশ্লীল ভিডিও অডিও তৈরি ও প্রদর্শনের বিরুদ্ধে।

৫. অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী সিনেমা, নাটক, গানবাদ্য, যাত্রা এবং অন্যান্য অশ্লীল চারুকলার বিরুদ্ধে।

৬. আদর্শ বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

৭. সহশিক্ষার বিরুদ্ধে।

৮. অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে।

৯. যাবতীয় নেশা ও নেশাভিত্তিক আড্ডাখানার বিরুদ্ধে।

১০. ধর্মহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে।

১১. অপসংস্কৃতির ধারক বাহক এন, জি, ও দের অপকর্মের বিরুদ্ধে।

১২. ইসলাম বিরোধী মিশনারিদের তৎপরতার বিরুদ্ধে।

১৩. সুদ, জুয়া, যুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে।

এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিতে হবে। মানুষের মাঝে তীব্র আদর্শবাদী চেতনাবোধ সৃষ্টি করে এগুলোকে নির্মূল করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

> "আমাদের সংস্কৃতিকে বিজাতীয় ও আদর্শ বিরোধী উপাদান ও ভাবধারামুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন, ক্লান্তিকর। এ পথে পদে পদে বাধা বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পূর্ণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতিক্ষায় উদগ্রীব।"১৩
>
> (৩ আগষ্ট ঃ ১৯৯৩)

---

১৩. জাহানে নও ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯।

শিক্ষা

অনুবন্ধ

অনেক প্রতিভা দিয়ে মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রতিভাকে যতো বেশি কাজে লাগানো যায়, ততোই তা বিকশিত হয়। মানুষ তার প্রতিভাকে বিকশিত করে দুনিয়া পরিচালনা করে। মানব জীবনের যতোটি বিভাগ আছে তার সর্বক্ষেত্রেই মানুষ নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে তার মধ্যে আবার দু'টি প্রবৃত্তি ও প্রবণতা দিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি ভালো আরেকটি মন্দ। আর সে তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুযায়ীই তার প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। উভয় প্রবণতার যেটা তার মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়, তার যোগ্যতাও সেদিকেই বিস্তার লাভ করে।

এমতাবস্থায় তার মন্দ প্রবণতাকে বিজিত এবং ভালো প্রবণতাকে বিজয়ী করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে যমীন ও যমীনের অধিবাসীরা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারেনা। আর এ জন্যেই প্রতিটি দেশে এমন একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যা তার সর্বপর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সৎ প্রবণতা অনুযায়ী দৃষ্টিভংগি ও মন মানসিকতার দিক থেকে একটি মজবুত অট্টালিকায় পরিণত করবে। বস্তুত একটি আদর্শ জাতির সর্বপ্রকার শিক্ষার লক্ষ্য হবে একটি। যে কোনো বিভাগের শিক্ষা তার শিক্ষার্থীকে একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও ধাবিত করবে। ব্যাপক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করেও যেন তাদের সকলের মন হয় এক, চিন্তা হয় অভিন্ন। একই জনবসতিতে যে লোকগুলো বাস করে, তাদের আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, মন মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা যদি এক না হয়, তবে তারা 'এক জাতীয়' হতে পারেনা। শিক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের। শিক্ষা যদি হয় লক্ষ্যহীন, তবে সে জাতির নেতৃত্বও লক্ষ্যহীনই হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে জাতির উপর নেমে আসে বিরামহীন বিপর্যয়।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। মুসলিম আমলের পর বৃটিশ শাসনামলে সম্রাজ্যবাদীরা এ দেশের নাগরিকদের লক্ষ্যহীন করে দেয়ার জন্যে চাপিয়ে দেয় লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। অবশেষে সম্রাজ্যবাদীরা

বিদায় নিলেও তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠে এ দেশীয় লক্ষ্যহীন ব্যক্তিত্ব। বার বার ভূখন্ডের স্বাধীনতা লাভ করলেও আমরা আজ পর্যন্ত একটি একমুখী আদর্শবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার সাক্ষাত লাভ করতে পারিনি। যার ফলে জাতীয় পর্যায়ে চরম অস্থিরতা জাতিকে অবিরাম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

লক্ষ্যহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস, মন মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে বিভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে। এ শিক্ষা উদার নয়, সংকীর্ণ। এ শিক্ষায় ব্যক্তিগত চিন্তার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় ও সর্ব মানবিক চিন্তা করার অবকাশ খুবই কম। এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা মানসিকতার ভিত নেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন করে দিচ্ছে। মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছার ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে বাকি রাখছেনা। তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন ও সৎ প্রবণতাকে বিজয়ী ও বিকশিত করে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এতে নেই।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতই মারাত্মক যে তা একই আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়। আকীদা বিশ্বাসের এ বিভিন্নতার কারণে বিদ্যাপীঠগুলোতে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের উচ্চ শিক্ষাংগনগুলোতে আদর্শিক দ্বন্দ্ব এতই প্রকট যে, এ জন্যে অহরহ সংঘর্ষ লেগে আছে। কারো কারো মতে শিক্ষার প্রস্তুতির চাইতে সংঘর্ষের প্রস্তুতিতেই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময় কাটে। ফলে সেশনজট লেগেই আছে।

বলাবাহুল্য এ ছাত্ররাই আবার শিক্ষক হয়। তাই, আমাদের ছাত্র শিক্ষক সকলের জীবনই লক্ষ্যহীন, লক্ষ পথের অনুসারী। মোট কথা দেউলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষাংগনগুলোতে আজ এমন চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, চিন্তাশীলরা জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে আতংকিত।

এ শিক্ষাই উৎপাদন করে আমাদের দেশের কর্ণধারদের। এ দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় তথা সর্বক্ষেত্রের নেতৃত্বের কাঠামোকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতির ধারা অসংখ্য গতিপথে প্রবাহিত। জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে।

শুধুমাত্র লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে জাতি আজ সর্বক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ সংকটকাল অতিক্রম করছে। জাতিকে এখন বাঁচানো প্রয়োজন। তাকে এখন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

তাই প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার, একটি আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থার। যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ইসলামী আদর্শের অনাবিল সংস্কৃতির বাহক। যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত আকীদা বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের মন মানসিকতাকে এক করে তুলবে। তাদের চিন্তাচেতনার গতিকে প্রবাহিত করবে অভিন্ন স্রোতে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের সৎ প্রবণতাকে লালন করবে, বিকশিত করবে এবং করবে দুর্জয়। আর তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন করবে, করবে নিরুৎসাহিত। তাদের মনকে করবে উদার। যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে তাদের জীবনবোধ উৎসারিত সংস্কৃতির বাহন এবং তাদেরকে তাদের জীবন লক্ষ্যে পৌঁছাবার সিঁড়ি। জীবনের যে ক্ষেত্রেই তারা কর্মরত থাকুকনা কেন তাদের জীবন লক্ষ্যকে করবে এক। তাদের পরিণত করবে একই চিন্তার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতিতে।

বলাবাহুল্য, বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের গোলামে পরিণত হবার পূর্বে এ দেশবাসীর হাতে এমনি একটি শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিলো। সে শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্ট নেতৃত্ব গোটা ভারত বর্ষকে সুনিপুণভাবে শাসন করেছে। আর তা হচ্ছে ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই নাগরিকদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টসমূহ সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু এ আপত্তিও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি।

তাই আমাদের জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে একটি আদর্শ মানব সমাজে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন অবিলম্বে এখানে ইসলামের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।[১]

১. 'যুগপূর্তি স্মরণিকা' আল আমীন একাডেমী, চাঁদপুর, মার্চ ১৯৯০ইং

১

শিক্ষা কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে গেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেটো শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন।

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়।

১ শিক্ষা কি?

এবার আমরা জানতে চেষ্টা করবো শিক্ষা কি? শিক্ষার সংজ্ঞা কি? তাৎপর্য কি? আর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? প্রথমে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে চাই। যেসব শব্দ ব্যবহার করে 'শিক্ষা' বুঝানো হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ শিক্ষার মর্ম বুঝার সহায়ক হবে। যেমন কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে তার উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত জরুরি।

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো ঃ শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান,

শিক্ষা। Educate মানে ঃ to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো।২

Joseph T. Shipley তাঁর `Dictionary of word Origins'-এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' এবং 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে 'তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া' এবং 'সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া।'

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক।৩

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন ঃ

> "Education denotes the realization of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge." ৪

কুরআন হাদীস এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেগুলো হলো ঃ ১. তারবীয়াহ (تربية) ২. তা'লীম (تعليم) ৩. তা'দীব (تأديب) ৪. তাদরীব (تدريب) ৫. তাদরীস (تدريس)।

এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ ঃ

● تربية শব্দটি নির্গত হয়েছে ربو শব্দ থেকে। ربو মানে ঃ Increase, to grow, to grow up, to exeed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to bread, to develop, augment.

আর تربية মানে ঃ Education, up bringing, Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising.৫

---

২. Samsad English-Begali Dictionary, Calcutta 22nd pression September 1990.

৩. মোহাম্মদ আজহার আলী ঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী-১৯৮২।

৪. Education in Islamic Society : A.M. Chowdhury : Dhaka 1965

৫. মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়াতুল মু'আসিরাহ By J. Milton Cowan.

● تعليم শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। তা'লীম (تعليم) মানে ঃ Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship.৬

● تأديب [তা'দীব] শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب [আদব] শব্দ থেকে। 'আদব' (أدب) মানে ঃ Culture, Refinement, Good breeding, Good manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ أدب [আদব] শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب শব্দ। তাই তা'দীব শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন এইসব অর্থও নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে তা'দীব দ্বারা Education এবং Disciplineও বুঝায়।৭

● تدريب [তাদরীব] মানে ঃ Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring.৮

● تدريس [তাদরীস] শব্দটি গঠিত হয়েছে درس [দরস্] শব্দ থেকে। তাদরীস মানে ঃ To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, tution.৯

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাংখিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন, পাঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাংখিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আভিধানিক অর্থ থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ

---

৬. পূর্বোক্ত।
৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৮. উক্ত গ্রন্থ।
৯. উক্ত গ্রন্থ।

১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/বড় করে তোলা।

২. উন্নত করা/উঁচু করা/অগ্রসর করানো।

৩. পূর্ণতা দান করা/মহত্তর করা/মহান করা/প্রস্ফুটিত করা।

৪. জাগিয়ে তোলা/উত্থিত করা/উজ্জীবিত করা।

৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/গড়ে তোলা।

৬. লালন পালন করা/প্রতিপালন করা।

৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা।

৮. অভ্যাস করানো/অনুশীলন করানো/হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া/চর্চা করানো/ নিয়মানুবর্তিতা শেখানো।

৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া/জ্ঞাপন করা/উপদেশ দেয়া।

১০. অনাকাংখিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন করা/সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা।

১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/জন্মগত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া।

১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা।

১৩. পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

১৪. প্রেরণা দেয়া/উদ্বুদ্ধ করা/উদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা।

১৫. সন্ধান দেয়া/ সংবাদ দেয়া/ তথ্য প্রদান করা।

১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো।

১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান।

১৮. শিক্ষা নবিশিতে ভর্তি হওয়া।

১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘসে মেজে পরিচ্ছন্ন করা/নির্মল করা।

২০. শালীনতা, ভদ্রতা শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার শেখানো।

২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও অমায়িক আচরণ শেখানো।

২২. আদব কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালী শেখানো।

২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/সচ্চরিত্র শিক্ষাদান।

২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো।

২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা।

২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মেঅভ্যস্ত করানো/কৌশল শেখানো/নিপুণতা অর্জনে সহায়তা করা।

২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা।

২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিন্তাভাবনা করা/গবেষণা করা/ পুংখানুপুংখ পরিক্ষা করা/অনুসন্ধান করা।

২৯. উদ্ভাবন করা।

৩০. বিদ্যার্জন করা/পান্ডিত্য অর্জন করা/শেখা/জানা/ দক্ষতা অর্জন করা।

আরবি ও ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষার জন্যে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, এ হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পূরো জীবন পরিব্যাপ্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাংগ জীবনে যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমই হলো শিক্ষা।

২ শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রথমেই দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীরা কে কি বলেছেন ঃ

❑ **জন ডিউই বলেছেন ঃ** "শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।"

❑ **প্লেটোর মত হলো ঃ** "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্যে যা কিছুই প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

❑ **প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে ঃ** "শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।"

❑ **এরিস্টোটল বলেছেন ঃ** "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।"

❑ **শিক্ষাবিদ জন লকের মতে ঃ** "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন

প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ।"

❑ **বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন ঃ** "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের কাংখিত প্রকাশ।"

❑ **কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Froebel-এর মতে ঃ** "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।"

❑ **কমেনিয়াসের মতে ঃ** "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা।"

❑ **শিক্ষাবিদ Pestalazzi বলেছেন ঃ** "দেহ ও মনের সমান্তরাল পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

❑ **পার্কার বলেছেন ঃ** "পূর্ণাংগ মানুষের আত্ম প্রকাশের জন্যে যেসব গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন।"

❑ **জীন জ্যাক রুশোর মতে ঃ** সুঅভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

❑ **Bartrand Russell -এর একটি মন্তব্য হলো ঃ**

> ".............The education system we must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl an opportunity for the best that exists."

❑ **স্যার পার্সীনান বলেছেন ঃ** শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ "চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা।"

❑ **ডঃ হাসান জামান বলেছেন ঃ** "প্রত্যয় দীপ্ত মহত জীবন সাধনায় সঞ্জিবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

❑ **ডঃ খুরশীদ আহমদের মতে ঃ** "স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা .... এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

❑ **আল্লামা ইকবালের মতে ঃ** "পূর্ণাংগ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

❑ **বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ মওদূদী [রঃ]**

বলেন ঃ

"মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখেনা, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও মগজ। রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভংগি ও মতামত। জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের অভ্যন্তরীণ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়। অতপর সেই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠে। এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনাদর্শ, তাদেরকে অবশ্যি তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। আর সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।"১০

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতভাবে 'শিশু অধিকার সনদ' গৃহীত হয়। এতে চুয়ান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। 'অনুচ্ছেদ ২৮' শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার দলিল। অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অুনচ্ছেদটি নিম্নরূপ ঃ

"**শিক্ষার লক্ষ্য**

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে-

   ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ;

   খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

   গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

   ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং

---

১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তালীমাত।

সকল মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি;

ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।"

এই অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিতে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হলো ঃ

১. ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ;
২. মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ;
৩. মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ;
৪. শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ;
৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৬. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৭. জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৮. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৯. নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১০. নিজস্ব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১১. নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১২. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১৩. অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১৪. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ;
১৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

৩ শিক্ষার্জন প্রক্রিয়া

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করে যাচ্ছে। কোনো না কোনো উপায়ে সে অবিরাম জ্ঞানার্জন করেই চলেছে। শ্রেণীকক্ষ আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ প্রতিনিয়ত জগতের সকলের এবং সকল কিছুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করছে, অর্জন করছে জ্ঞান। এই অবিরাম ও প্রতিনিয়ত শিক্ষা কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Informal Education.

২. উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Nonformal Education.

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Formal Education.

বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক এ শিক্ষার প্রধান প্রধান উপকরণ। এছাড়া সময়ের সীমারেখা, পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা, পরিক্ষার বিধিবদ্ধতা, কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতির বেষ্টনীতে এ শিক্ষার বসবাস। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এসব আনুষ্ঠানিকতা পূরোপূরি থাকেনা বটে, তবে কিছু কিছু থাকে। আবার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাও এটা নয়।

আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যাতে কোনো কৃত্রিম আয়োজন নেই। এখানে গোটা সমাজ আর পূরো বিশ্বজগতই মানুষের শিক্ষাগার। কোনো প্রকার বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মানুষ এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখেই চলে।

এ ক্ষেত্রে মানুষের মা তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, তার বাপ শিক্ষক। ভাই বোন, চাচা চাচি, দাদা দাদি, নানা নানিসহ সকল আত্মীয় স্বজন তার শিক্ষক। তার প্রতিবেশীরা তার শিক্ষক। তার পরিবেশ তার শিক্ষক। তার সমাজ ও চলমান সামাজিক কার্যক্রম তার শিক্ষক, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তার শিক্ষক। চলমান বিশ্ব ও বিশ্ব ব্যবস্থা তার শিক্ষক। প্রকৃতি তার শিক্ষক। তার নিজের সৃষ্টিতে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। নক্ষত্ররাজি, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং রাতদিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। এসবের কাছ থেকে এবং এসব কিছু থেকে মানুষ তার চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে আর মনমস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব উপলব্ধি করে দিনরাত অবিরাম শিখছে আর শিখছে। আহরণ করছে জ্ঞান আর জ্ঞান। বিকশিত করছে নিজের দেহ ও মনকে। প্রস্ফুটিত ও পরিশুদ্ধ করছে নিজের আত্মাকে। প্রখরিত করছে নিজের বিবেককে। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অকৃপণ, উদার ও প্রাকৃতিক। কেউই বঞ্চিত হয়না এ শিক্ষা থেকে।

২

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ঃ আল কুরআনের আলোকে

১. জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ তা'আলা

আল কুরআন বলে, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। সবকিছুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . (التوبه : ٧٨)

"তারা কি জানেনা, আল্লাহ্ তাদের গোপন কথা, গোপন সলাপরামর্শ সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে পূরোপূরি অবহিত?" [সূরা তাওবা ঃ ৭৮]

اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ - (الاحقاف : ٢٣)

"সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ তা'আলা।" [সূরা আল আহকাফ ঃ ২৩, সূরা আল মূলক ঃ ২৬]

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا - (الطلاق : ١٢)

"আর আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" [তালাক ঃ ১২]

وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا- (الانعام : .٨ الاعراف : ٨٩)

"আমার প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত।" [সূরা আনআম ঃ ৮০, সূরা আ'রাফ ঃ ৮৯]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : (الحشر : ٢٢)

"তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি দয়াময় করুণাধার।" [সূরা হাশর ঃ ২২]

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- (النور : ١٨، ٥٨، ٥٩)

"আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।" [আন নূর ঃ ১৮, ৫৮, ৫৯]

২. আল্লাহ্ই মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন

কুরআন বলে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি জ্ঞান দান না করলে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا- (البقرة : ٣١)

"আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন।" [বাকারা ঃ ৩১]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

"দয়াময় মেহেরবান আল্লাহই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।" [সূরা আর রাহমান ঃ ১-৪]

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- (العلق : ٥-٣)

''পড়ো, তোমার প্রভু বড়ই দয়াশীল। তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতোনা। [সূরা আল আলাক ঃ ৩-৫]

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ، يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ، وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا- وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ- (البقرة : ٢٦٩-٢٦٨)

"আল্লাহ অতি প্রশস্ত উদার মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, সে বিরাট কল্যাণের অধিকারী। আর শিক্ষা লাভ করে তো কেবল তারাই যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮-২৬৯]

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِن لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ- (النمل : ٦)

"হে মুহাম্মদ! অবশ্যি তুমি এই কুরআন এক সুবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহান সত্তার কাছ থেকে লাভ করছো।" [সূরা আন নামল ঃ ৬]

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ- (النساء : ١١٣)

"আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন আর তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন।" [সূরা নিসা ঃ ১১৩]

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً- (الكهف : ٦٥)

"আর আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫]

وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ- (يوسف : ٦٨)

"নিঃসন্দেহে সে আমার দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিলো।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৬৮]

رَبِّى قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ - (يوسف : ١٠١)

"আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো। আমাকে সকল কথার মর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষাদান করেছো। " [সূরা ইউসুফ ঃ ১০১]

وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلاً- (بنى اسرئيل : ٨٥)

"তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫]

৩. নবীদের পাঠানো হয়েছে শিক্ষাদানের জন্য

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (البقرة : ١٥١)

"যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জানোনা, সেগুলো তোমাদের শিক্ষা দেয়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً- (اسراء : ١٠٦)

"এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর আমি এটা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।" [সূরা বনি ইসরাইল ঃ ১০৬]

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ- (البقرة : ٣٨)

"অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমদের কাছে হিদায়াত [অর্থাৎ নবী ও কিতাব] আসবে, তখন যারা আমার নবী ও কিতাবকে অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ বেদনা থাকবেনা।" [সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮]

নবীদেরকেই মানবতার প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর তাদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণের শিক্ষা। নবীগণ সারা জীবন মানুষকে তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই আদর্শ শিক্ষক ছিলেন নবীগণ আর আদর্শ শিক্ষা ছিলো তাঁদের শিক্ষা। তাঁদের শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো আল কুরআন।

৪ জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ- (المجادله : ١١)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" [সূরা মুজাদালা ঃ ১১]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ-(الزمر : ٩)

"ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানেনা এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে?" [সূরা যুমার ঃ ৯]

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا- (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির ঃ ২৮]

وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (ال عمران : ١٨)

"এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকেরাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮]

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ- (النمل : ٤٠)

"কিতাবের জ্ঞান ছিলো এমন এক ব্যক্তি বললো, আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই ওটি এনে দিচ্ছি।" [সূরা আন নামল ঃ ৪০]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا- (القصص : ٨٠)

"কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বলল ঃ তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ হয়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তার জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।" [সূরা আল কাসাস ঃ ৮০]

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ-

"জ্ঞানের অধিকারী লোকদের অন্তরে তো এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন।" [সূরা আনকাবূত ঃ ৪৯]

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰـاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ- (البقره : ٢٤٧)

"আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন, কারণ তাকে অঢেল মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৭]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ- (اسراء : ٣٦)

"এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়োনা, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৬]

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ- (البقرة : ٢٣٩)

"আল্লাহ্‌কে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯]

৫. জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ

قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا- (طه : ١١٤)

"বলো ঃ প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - (العلق : ١)

"পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ১]

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ – (المزمل : ٢٠)

"যতোটা কুরআন সহজে পাঠ করতে পারো, পাঠ করো।" [মুজ্জাম্মিলঃ ২০]

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا– (المزمل : ٤)

"আল কুরআন পাঠ করো তরতিলের সাথে।" [সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– (النمل : ٩٨)

"যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" [সূরা আন নামল ঃ ৯৮]

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ– (النحل-

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।" [সূরা আন নহল ঃ ৪৩]

وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَاب – (اسراء : ١٢)

"এবং তোমরা যেনো বছর ও মাসের হিসাব জানতে পারো।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১২]

৬. শিক্ষার উদ্দেশ্য

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ–

"তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা [ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে] বিরত থাকতে পারে।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১২২]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ- (ال عمران : ٧٩)

"কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবূয়্যত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯]

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا- قَالَ لَهُ مُوسَىٰ : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا- (الكهف : ٦٦-٦٥)

"সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্যের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেন?" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫-৬৬]

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ- (محمد : ١٩)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯]

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ- (البقرة : ٢٠٣)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২০৩]

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ- (البقرة : ٢٢٣)

"জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।" [সূরা বাকারা ঃ ২২৩]

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ- (البقرة : ٢٣٣)

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ অবশ্যি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা বাকারা ঃ ২৩৩]

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَوْلاَدُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ- (الانفال : ٢٨)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরিক্ষার বস্তু আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে অবশ্যি বড় পুরস্কার।" [সূরা আনকাল ঃ ২৮]

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ-

"জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। উত্তম অভিভাবক তিনি আর উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা আনফাল ঃ ৪০]

فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلاَدِ ..... وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ- الحديد : ٢٠)

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।....... বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষ।" [সূরা আল হাদীদ ঃ ২০]

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ- (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহ্র দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির ঃ ২৮]

وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ- (ال عمران : ٩-٧)

"জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে ঃ আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ঃ প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিওনা। তোমার রহমতের ভান্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ভংগ করেননা অংগীকার।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭-৯]

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ- (الجمعة : ٢)

"তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" [সূরা আল জুমুয়া ঃ ২]

'হিকমাহ' মানে-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ- (الحديد : ٢٥)

"আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" [আল হাদীদ ঃ ২৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا- (القصص : ٨٠)

"কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো ঃ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহ্‌র পুরস্কারই উত্তম।" [সূরা কাসাস ঃ ৮০]

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে তৈরি করা।

২. দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।

৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।

৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আকাংখী হওয়া।

৭. আল্লাহ্‌কে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।

৮. আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

৯. আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন।

১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।

১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।

১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।

১৪. মানব সমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন।

১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।

১৬. সূরা আল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্কে জানা, আল্লাহ্র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

৭ শিক্ষা দান পদ্ধতি

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ- (الرحمن : ٤-٣)

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।" [সূরা আর রাহমান ঃ ৩-৪]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً- (اسراء : ١٠٦)

"এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর এ উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬]

فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ- (القيامه : ١٨)

"আমরা যখন এই কিতাব তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি মনোযোগ সহকারে এর পাঠ অনুসরণ করো।" [সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৮]

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ- البقرة : ١٥١)

"যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে; তোমাদেরকে আল কিতাব ও

হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জাননা, সেগুলোও তোমাদের শিখায়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

এ যাবত যে আয়াতগুলো পেশ করা হলো, সেগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম ঃ

১. ছাত্রদের বলতে শিখাতে হবে।

২. অল্প অল্প করে পড়া দিতে হবে।

৩. পাঠাভ্যাস করাতে হবে।

৪. শিক্ষককেও পাঠ করতে হবে।

৫. সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে দিতে হবে।

৬. চিন্তা ও চরিত্র সংশোধন করতে হবে।

৭. জ্ঞান ও কর্মপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে হবে।

৮. অজানাকে জানাতে হবে।

৯. আল কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।

১০. সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে ঃ

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى- (الاعلى : ٨)

"আমি তোমাকে সহজ পদ্ধতির সুবিধা দিচ্ছি।" [সূরা আল আ'লা ঃ ৮]

১১. জড়তামুক্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে শিখাতে হবে ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِىْ يَفْقَهُوْاقَوْلِىْ- (طه : ٢٨)

"প্রভু! আমার ভাষার জড়তা খুলে দাও, যাতে তারা আমার কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।" [সূরা তোয়াহা ঃ ২৮]

১২. প্রামান্য ও দর্শনীয় উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

১৩. সুসংবাদ দিতে হবে।

১৪. সতর্ক করতে হবে।

১৫. আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতে হবে এবং

১৬. প্রদীপ যেমন আলো বিতরণ করে, তেমনি শিক্ষককে অবিরত জ্ঞান বিতরণ করতে হবে ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ

بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا- (الاحزاب : ٤٦-٤٥)

"আমি তোমাকে পাঠিয়েছি প্রমাণ হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫-৪৬]

১৭. অন্যমনস্ক ও বিরক্তির সময় শিক্ষা দেয়া ঠিক নয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিতে হবে। মনোযোগী হলেই কেবল শিক্ষা দেয়া উচিত ঃ

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى- الاعلى : ٩)

"শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো, যতক্ষণ তা উপকারী হয়।" [সূরা আল আ'লা ঃ ৯]

১৮. ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ- (الانعام : ٥٠)

"ওদের জিজ্ঞেস করো ঃ অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি কখনো এক হতে পারে? [সূরা আল আনআ'ম ঃ ৫০]

قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ- (البقره : ١٤٠)

"ওদের জিজ্ঞাসা করো ঃ আচ্ছা, তোমরা বেশি জানো নাকি আল্লাহ্ বেশি জানেন?" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৪০]

১৯. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের সঠিক ও সন্তোষজনক জবাব দেয়া ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ-

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি জবাব দাও যে, তোমাদের জন্যে সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে।" [সূরা আল মায়িদা ঃ ৪]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّىْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا- (اسراء : ٨٥)

"তোমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করছে, জীবন (Life) কি? তুমি জবাব দাও যে, 'জীবন' হলো আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। এ ব্যাপারে তোমাদের খুব কমই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫]

২০. শিক্ষার্থীদের যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা,

২১. শিক্ষার্থীদের পরম কল্যাণকামী হওয়া,

২২. শিক্ষার্থীদের প্রতি পরম স্নেহশীল, কোমল ও দয়ালু হওয়া ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيمٌ -(التوبه : ١٢٨)

"তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল এসেছে। তোমাদের ক্ষতি করে এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের পরম কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়া পরবশ।" [তাওবা ঃ ১২৮]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ - (ال عمران : ١٥٩)

"এটা আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি বড় কোমল। তুমি যদি কর্কশভাষী কিংবা কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে এরা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯]

২৩. শিক্ষককে নিজের খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই শিক্ষা দিলে হবেনা। তাকে শিক্ষা দিতে হবে চিরন্তন সত্য ও সঠিক তথ্য ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى- (النَّجْم : ٣-٢)

"তোমাদের এই সাথি না কখনো সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে আর না সঠিক চিন্তা ভ্রষ্ট হয়েছে আর না সে নিজের খেয়াল খুশিমতো কথা বলে।" [সূরা আন নাজম ঃ ২-৩]

৮. শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

১. প্রথমে আউযুবিল্লাহ্‌ পড়ে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে নিতে হবে ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، (النمل : ٩٨)

"যখন কুরআন পড়বে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" [সূরা আন নামল ঃ ৯৮]

২. অতপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু করতে হবে ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- (العلق : ١)

"তোমার প্রভুর নামে পাঠারাম্ভ করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ১]

৩. মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে,

৪. ক্লাসে নিরবতা অবলম্বন করতে হবে ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (الاعراف : ٢٠٤)

"যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নিরবতা অবলম্বন করবে। সম্ভবত এতে করে তোমরা রহমত লাভ করবে।" [সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৪]

৫. না জানলে প্রশ্ন করতে হবে ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-

"জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো।" [আন নাহল ঃ ৪৩]

৬. পড়ার সাথে সাথে লিখতেও হবে ঃ

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- (العلق : ٤-٣)

"পড়ো, তোমার রব বড়ই সম্মানিত। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ৩-৪]

৭. নিজের মধ্যে পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে ঃ

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ- (التوبه : ١٢٢)

"তারা যেনো দীনের পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি অর্জন করে।" [তাওবা ঃ ১২২]

৮. মুখের জড়তা দূর করতে হবে ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِى يَفْقَهُوا قَوْلِى-(طه : ٢٨)

"আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেনো লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।" [সূরা তোয়াহা ঃ ২৮]

৯. চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে পড়তে হবে ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوالاَلْبَابِ- (ص : ٢٩)

"এ এক বরকতময় কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেনো লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে আর বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। [সূরা সোয়াদ ঃ ২৯]

১০. দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে থেমে থেমে পড়া ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيلاً- (المزمل : ٤)

"আল কুরআন পড়ো ধীরে বুঝে থেমে থেমে।" [সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

১১. শ্রবণ, দর্শন ও অনুধাবন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে ঃ

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ- (الاعراف : ١٧٩)

"তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা ও উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা। এদের অবস্থা পশুর মতো, বরং তার চাইতে বিভ্রান্ত। এরা আসলে একেবারে অচেতন হয়ে আছে।" [আ'রাফ ঃ ১৭৯]

১২. শিক্ষকের পাঠ অনুসরণ করতে হবে ঃ

فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ- (القيامه : ١٨)

"আমরা যখনই এ গ্রন্থকে তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠ অনুসরণ করবে।" [সূরা আল কিয়ামাহ্ ঃ ১৮]

১৩. সঠিক জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ঃ

قَالَ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا- (الكهف : ٦٦)

"মূসা বললো ঃ আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আপনি তা থেকে আমাকে শিখাতে পারেন?" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৬]

১৪. শিক্ষা গ্রহণে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া ঃ

قَالَ سَتَجِدُونِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا- (الكهف : ٦٩)

"মূসা বললো ঃ আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর কোনো ব্যাপারে আমি আপনার হুকুম অমান্য করবোনা।" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৯]

১৫. অধিক অধিক জ্ঞান লাভের জন্যে মহান প্রভু আল্লাহ্র কাছে অবিরত প্রার্থনা করতে হবে ঃ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا- (طه : ١١٤)

"আর বলো ঃ প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

৩

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ঃ হাদীসের আলোকে

জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন। এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি। তিনি এ মহাগ্রন্থের বাহক। তিনি এর ব্যাখ্যাতা। এ গ্রন্থের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা দান, প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্যে তাঁকে দেয়া হয়েছে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ।

তিনি এ গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেভাবে তা প্রচার করেছেন, যেভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে তা কার্যকর করেছেন, তার বিবরণ সংরক্ষিত হয়েছে হাদীস ভান্ডারে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো রসূলুল্লাহর বাণী বা হাদীস।

এখানে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেকগুলো বাণী চয়ন করে দিচ্ছি। এর ফলে জ্ঞান পিপাসুরা তৃপ্তি লাভ করতে পারবেন, আর শিক্ষা গবেষকরা পথের দিশা পাবেন। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে সেই গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করা হয়েছে যাতে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় ইসলামী শিক্ষার উপর কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। শুধু বংগানুবাদ করে দেয়া হলো।

১ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يفقه فِى الدِّيْنِ-(بخارى ومسلم)

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সঠিক বুঝ জ্ঞান দান করেন।" [বুখারি, মুসলিম]

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا- (مسلم)

"সোনা রূপার খনির মতো মানুষও [বিভিন্ন প্রকারের] খনি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম [গুণ বৈশিষ্টধারী] হয়ে থাকে, দীনের সঠিক বুঝজ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই উত্তম হয়ে থাকে।" [মুসলিম, আবু হুরাইরা]

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَاَحَقُّ بِهَا-

"জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানেই তা পাওয়া যাবে, প্রাপকই তার অধিকারী।" [তিরমিযি, ইব্‌নে মাজাহ]

কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে 'জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো ধন।'

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ-

"ইসলামের একজন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের কাছে হাজারো [অজ্ঞ] ইবাদত গুজারের চাইতে ভয়ংকর।" [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ- (ابن ماجه،بيهقى)

"জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ।" [ইবনে মাজাহ্, বায়হাকি]

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ- (رواه رزين- مشكوة)

"দীনের জ্ঞানী ব্যক্তি কতইনা উত্তম মানুষ। তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের উপকৃত করেন, আর না এলে তিনি কারো মুখাপেক্ষী হননা।" [রিযযীন, মিশকাত]

فَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ- (بيهقى)

"জ্ঞানের আধিক্য [নফল] ইবাদতের আধিক্যের চাইতে উত্তম।" [বায়হাকি ঃ আয়েশা রা]

اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ - (رواه دارمى)

"সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, জ্ঞানীদের মধ্যে যারা উত্তম।" [দারমি]

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ-

"কোনো বাবা মা তাদের সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করতে পারেনা।" [তিরমিযি]

২ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদা

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ-
(مسلم : ابو هريره)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব [কুরআন] পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে নেয় তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকূল। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারেনা।" [মুসলিম]

اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًى لِطَالِبِ الْعِلْمِ-

"ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণ কারীদের জন্যে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় [অর্থাৎ তাদের সহযোগিতা করে ও উৎসাহিত করে।" [মুসনাদে আহমদ]

مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ- (ترمذى، دارمى)

"জ্ঞান লাভে নিরত ব্যক্তি তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত বলে গণ্য হবে।" [তিরমিযি, দারমি]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى- (ترمذى، دارمى)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করে, একাজের ফলে তার অতীতের দোষত্রুটি মুছে যায়।" [তিরমিযি, দারমি]

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ- (بخارى : عثمان)

"তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল মানুষ সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শিখায়।" [বুখারি ঃ উসমান রাঃ]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَاَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ- فَاِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ- (دارمى)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তা অর্জন করেছে, তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পেরে থাকে তবু একগুণ প্রতিদান রয়েছে।" [দারমি]

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا-

"রাতের একটি অংশ জ্ঞান চর্চা করা, সারা রাত [ইবাদতে] জাগ্রত থাকার চাইতে উত্তম।" [দারমি]

৩ জ্ঞানীদের উচ্চমর্যাদা

اِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ، وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ- (مسند احمد، ترمذى، ابو داؤد،)

"জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।" [আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ]

জ্ঞানীগণ আল্লাহর সকল সৃষ্টির মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং সমস্ত সৃষ্টিই তাদের কল্যাণ কামনা করে।

জ্ঞানহীন আবেদ বা ইবাদতগুজার ব্যক্তি যথার্থভাবে মর্ম উপলব্ধি করে ইবাদত করতে পারেনা। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যথা নিয়মে মর্ম উপলব্ধি করে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। ফলে তার মর্যাদা জ্ঞানহীন ইবাদতগুজারের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে।

নবীগণ মূলত আল্লাহ্র কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে আসেন আর মানুষের কাছে তারা জ্ঞানই প্রচার করেন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নবীদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

৪ শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً– (رواه البخارى)

"আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও মানুষকে পৌঁছে দাও।" [বুখারি]

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ،

"মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল [তার আমল নামায়] যোগ হতে থাকে। সেগুলো হলো ১. সাদাকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান [প্রচার ও শিক্ষাদান করে যাওয়া] যাতে মানুষ উপকৃত হতে থাকে ৩. এবং এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যারা তার জন্যে দোয়া করতে থাকে।" [সহীহ মুসলিম]

শিক্ষা এমন একটি জিনিস, যা বিতরণে কমেনা, বরং বাড়ে, বাড়তে থাকে। জ্ঞান যতোদিন বিতরণ হতে থাকবে, যতোদিন এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের কাছে জ্ঞান হস্তান্তর করতে থাকবে, ততোদিন পূর্ববর্তী জ্ঞান বিতরণকারীরা মরে গিয়েও

এর ফায়দা লাভ করতে থাকবেন। কারণ এ জ্ঞান তাদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়ে এসেছে।

لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا- (بخارى، مسلم)

"দু'ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। তাদের একজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ অর্থ সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করবার মনোবৃত্তিও তাকে দান করেছেন। আর অপরজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তারই ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আর মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়।" [বুখারি, মুসলিম]

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَهُوَ كَفَاعِلِهٖ- (مسلم)

"যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায়, সে উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।" [মুসলিম]

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَافَظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا- فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ- وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ اَفْقَهُ مِنْهُ- (ترمذى، ابو داؤد)

"আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চাইতে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়।" [তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারমি, বায়হাকি]

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ- اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِى عَلٰى اَدْنَاكُمْ- (دارمى)

"হাসান বসরি [র] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাদের একজন হলেন জ্ঞানী। তিনি ফরয নামায পড়ে মানুষকে সুশিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর অপর ব্যক্তি দিনে রোযা রাখেন এবং রাত্রে নামাযে নিরত থাকেন, এদের মধ্যে কে অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি যে ফরয নামায পড়ে মানুষকে সুশিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করে, সে রাত দিন নামায রোযায় নিরত ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় এতোটা উত্তম ও মর্যাদাবান, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর] মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি।"

اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَ حَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْماً عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهٗ اَو وَرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ اَوْ بَيْتاً لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْراً اَجْرَاهُ مُصْحَفاً اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ تَلْحِقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ - (ابن ماجه، بيهقي)

"মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমল নামায় যোগ হতে থাকবে, সেগুলো হলো : ১. কল্যাণকর জ্ঞান যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার প্রসার ও বিস্তার করে গেছে, ২. সৎ সন্তানের [দোয়া ও সৎ কাজ] যাকে সে পৃথিবীতে রেখে গেছে, ৩. কোনো গ্রন্থ রচনা করে তাকে নিজের শিক্ষাদান কাজের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছে, ৪. নির্মাণ করে গেছে কোনো মসজিদ, ৫. বানিয়ে গেছে কোনো সাধারণ পান্থনীড়, ৬. ব্যবস্থা করে গেছে মানুষের জন্যে পানির, ৭. অথবা সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় করে গেছে কোনো দান, এসবগুলোর সওয়াবই পৌঁছতে থাকবে তার কাছে মৃত্যুর পরেও।" [ইবনে মাজাহ, বায়হাকি]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ، اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اللّٰهَ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ، وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ- (دارمى)

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে এসে দু'টি মজলিশ দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি বললেন ঃ উভয় মজলিশের লোকেরাই ভালো কাজে লিপ্ত রয়েছে। তবে একটি মজলিশ অপরটির চাইতে উত্তম। এই যে মজলিশটি দোয়া প্রার্থনা ও আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি প্রকাশ করছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের দান করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু এই যে অপর দলটি, এরা জ্ঞানার্জন করছে এবং জ্ঞানহীনদের শিক্ষা দান করছে, এরা ওদের চাইতে উত্তম। আমিও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।" অতপর তিনি এ মজলিশেই বসে পড়লেন। [দারমি]

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْداً ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْداً، ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ، وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْماً فَنَشَرَهٗ، يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْراً وَحْدَهٗ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً- (بيهقى)

"তোমরা কি জানো সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? উপস্থিত লোকেরা বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সর্বাপেক্ষা বড় দাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা আমি। আমার পর বড় দাতা হবে সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান শিক্ষা করবে এবং মানুষের মাঝে তা বিস্তার করবে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা তিনি বলেছেন একটি উম্মতের বেশে উঠে আসবে।" [বায়হাকি]

এ হাদীসগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান চর্চা করা, জ্ঞান বিতরণ করা এবং জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পরম উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং চরম তাকিদ করেছেন।

৫ শিক্ষার উদ্দেশ্য

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةِ فِىْ حُجْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ-

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপিলিকা এবং পানির মৎস পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।” [তিরমিযি]

اِنَّ رِجَالاً يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا- (ترمذى)

“বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ছুটে আসবে দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের কল্যাণকর উপদেশ [শিক্ষা] দান করবে।” [তিরমিযি]

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (مسند احمد-ابو داؤد ابن ماجه : ابو هريره)

“যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবেনা।” [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ-

"প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই [কুরআন সুন্নাহর] এই জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত করবে।" [বায়হাকি]

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ- (دارمى)

"ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর।" [দারমি ঃ হাসান বসরি থেকে]

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ- (دارمى

و دار قطنى : عبد الله بن مسعود)

"তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা দীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো। তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো।" [দারমি]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদীসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. মানব কল্যাণ ।
২. সুশিক্ষা বিস্তার।
৩. আল্লাহ্‌কে জানা ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন।
৪. আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায় জানা।
৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা।
৬. ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করা।
৭. কর্তব্য পরায়ণ হওয়া।
৮. কুরআনের আলো বিস্তার।

৬ শিক্ষার কুউদ্দেশ্য/সংকীর্ণ উদ্দেশ্য

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো হলো, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় অবগত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় জানা, পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজে নেয়া এবং মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ সাধন। এটা শিক্ষার উদার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যও থাকে। এটাকে কুউদ্দেশ্যও বলা যেতে পারে। এ কুউদ্দেশ্য বা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لاَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ- (دارمى)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী হবে সেই জ্ঞানী, যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।" [দারমি]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاۤءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاۤءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ- (ترمذى، ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে কুতর্কে লিপ্ত হবার জন্যে, কিংবা মূর্খদের বিভ্রান্ত করার জন্যে, অথবা জনগণকে নিজের ব্যক্তি সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে জ্ঞান শিক্ষা করে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" [তিরমিযি, ইব্নে মাজাহ]

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُصِيبَ بِهِ غَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ- (مسند احمد، ابو داؤد،)

"যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবেনা।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ- (احمد-ترمذى-ابو داؤد- ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জ্ঞান রাখলো, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হবার পর তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।" [আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ اِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ- (مسلم)

"কিয়ামতের দিন অতপর বিচারের জন্যে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হবে, যে জ্ঞান শিক্ষা করেছে এবং মানুষকে শিক্ষা দান করেছে তাছাড়া কুরআনও পড়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীতে যেসব অনুগ্রহ তার প্রতি করেছিলেন সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সেগুলো স্মরণ করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছিলে? সে বলবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি, মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমাকে খুশি করবার জন্যে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যে বলছো। তুমিতো জ্ঞান চর্চা করেছো এ জন্যে, যেনো মানুষ তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর কুরআন পড়েছো এজন্যে, যেনো লোকেরা তোমাকে কুরআনের পন্ডিত বলে। এসব কথা মানুষ তোমাকে বলেছে [এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে]। অতপর তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [মুসলিম]

এই হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম শিক্ষার সংকীর্ণ ও কুউদ্দেশ্য কি কি? হাদীসের আলোকে শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল শিক্ষা অর্জন করা।

২. মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

৩. শিক্ষার সঠিক ধারাকে ব্যাহত করা।

৪. নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করা।
৫. পার্থিব স্বার্থ অর্জন করা।
৬. খ্যাতি লাভের প্রবণতা।
৭. শিক্ষা বিস্তারে কার্পণ্য করা।

৭ ভাল ছাত্রের বৈশিষ্ট

لَن يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ - (ترمذى : ابو سعيد الخدرى)

"মুমিন জ্ঞান ও কল্যাণের কথা যতোই শুনে তৃপ্ত হয়না। এই অতৃপ্ত অবস্থাতেই সে জান্নাতবাসী হয়।" [তিরমিযি ঃ আবু সায়ীদ খুদরি]

مَنْهُوْمَانِ لاَ يَشْبَعَانِ : مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا- (بيهقى : انس)

"দুই পিপাসু কখনো তৃপ্তি লাভ করেনা। একজন হলো জ্ঞান পিপাসু, সে যতোই জ্ঞান লাভ করুক, তৃপ্ত হয়না। আরেকজন হলো সম্পদ পিপাসু, সেও যতোই লাভ করে তৃপ্ত হয়না।" [বায়হাকি ঃ আনাস]

قَالَ اَىُّ عِبَادِكَ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ يَجْتَمِعُ عِلْمَ النَّاسِ اِلٰى عِلْمِهٖ-

"দাউদ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্! তোমার কোন্ বান্দাহ সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক জ্ঞানী হলো সে, যার জ্ঞান পিপাসা মেটেনা, যে সব মানুষের জ্ঞান সংগ্রহ করে এনে নিজ জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে।" (যাদে রাহ)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةً لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهٗ- (حاكم)

"কুরআন হলো আল্লাহ্র রজ্জু, অনাবিল আলো, নিরাময় দানকারী এবং উপকারী বন্ধু। যে তাকে শক্ত করে ধরবে তাকে সে রক্ষা করবে। যে তাকে মেনে চলবে, তাকে সে মুক্তি দেবে।" [হাকিম ঃ ইবনে মাসউদ]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে, তারাই হলো উত্তম ছাত্র যারা ঃ

১. জ্ঞানের কথা যতোই শুনে অতৃপ্ত থেকে যায়। যতোই শিক্ষা লাভ করে, ততোই তাদের আরো শিখবার উদগ্র কামনা জাগ্রত হয়।

২. মধু মাছি যেমন ফুলে ফুলে বসে মধু আহরণ করে, তারাও তেমনি জ্ঞানীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে।

৩. প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কুরআনকে অনুধাবন করে, আঁকড়ে ধরে এবং অনুসরণ করে।

৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ- (بخارى : انس)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, তখন তিনি [কোনো কোনো কথা] তিনবার পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন, যাতে করে শ্রোতারা তা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে।" [বুখারি ঃ আনাস]

مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ،

"জানা না থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে কাউকেও মত দেয়া হয়ে থাকলে, সে কাজের পাপ মত প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে এমন কোনো পরামর্শ দিলো, যে সম্পর্কে সে জানে যে, সঠিক ব্যাপার অন্যটি, তবে সে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করলো।" [আবু দাউদঃ আবু হুরাইরা]

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ- (ابو داؤد : معاويه رض)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করতে এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।" [আবু দাউদ ঃ মুয়াবিয়া]

آفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهٗ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَيْرَ اَهْلِهٖ-(دادمى)

"জ্ঞানের আপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর যারা যে জ্ঞানের যোগ্য নয়, তাদের কাছে সে বিষয়ে কথা বলা মানে জ্ঞান নষ্ট করা।" [দারমি]

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَالَا تَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ- (بخارى- مسلم)

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ হে লোকেরা ! তোমরা কেবল জানা বিষয়েই বলবে। আর যে বিষয়ে জানবেনা সে বিষয়ে বলবে ঃ আল্লাহ্ই অধিক জানেন। কেননা 'আল্লাহ্ই অধিক জানেন' একথা বলাটাই তোমার জ্ঞান।" [বুখারি, মুসলিম]

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا- (بخارى، مسلم)

"আমরা বিরক্ত হতে পারি এ আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে বিরতি দিতেন।" [বুখারি, মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ]

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ- (مسلم : جرير بن عبد الله)

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে, তার জন্যে সে কাজের প্রতিদান রয়েছে। তার পরে যারা সে কাজ করবে, সে জন্যেও সে প্রতিদান লাভ করবে, এতে তাদের প্রতিদান কমানো হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে কাজের পাপ তার ঘাড়েই

পড়বে। পরবর্তীতে যারা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে তাদের সে কর্মের পাপও তার ঘাড়ে পড়বে, এতে তাদের পাপও কমানো হবেনা। [মুসলিম]

এই হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে ঃ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাই শিক্ষা দিতেন, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তিনবার বলতেন।

২. অজ্ঞতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করা যাবেনা। অসত্য তথ্য দিয়ে প্রতারণা করা যাবেনা।

৩. বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করা যাবেনা।

৪. অযোগ্যদের কাছে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করা ঠিক নয়।

৫. শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিরতি জরুরি। বিরক্তি উদ্রেক করা যাবেনা।

৬. শিক্ষককে শিক্ষার অনুসরণ করে নিজেই বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হতে হবে।

৪

মহানবীর শিক্ষানীতি

আদর্শ জাতি গঠনের জন্যে প্রয়োজন আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিশ্বজনীন জাতি গঠনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ। এ আদর্শের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিরাট মানবগোষ্ঠী গঠন করে তাকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শুধুমাত্র মানুষকে ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের মাধ্যমেই তিনি এই বিরাট বিপ্লব সম্পাদন করেন। শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মানসিক বিপ্লব ঘটান। তারই ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। ইসলামী বিপ্লব ছাড়া বিনা বল প্রয়োগে শুধু শিক্ষা দানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আর কোনো বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। তাঁর এই শিক্ষাভিত্তিক বিপ্লব পৃথিবীর এক অনন্য ইতিহাস। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিপতিত একটি অধপতিত জাতিকে শুধুমাত্র আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে তিনি রূপান্তরিত করেন। গঠন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব দল। এ ছিলো একটি অনন্য আদর্শের অধিকারী মানব দল। কোনো দিক থেকেই তাঁদের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীর তুলনা হয়না। এখানে আমরা আলোচনা করে দেখবো, কোন্

ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অনন্য শ্রেষ্ঠ মানব দলটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

রসূলের শিক্ষানীতির কতিপয় দিক

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্র নবী। সর্বশেষ নবী। নবূয়্যতি মিশনের সর্বশেষ আদর্শ। তাঁর পরে এ বিশ্বে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা। তাই তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নবূয়্যতি শিক্ষা মিশনের পূর্ণতা দান করেন। এ কারণে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা কাঠামো ছিলো সর্বদিক থেকে পূর্ণাংগ। ষোলকলায় সমৃদ্ধ, সর্বাংগীন সুন্দর ও পরিপাটি। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মিত হয়েছিল মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর শিক্ষানীতি কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর জন্যে নয়, বরং বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। তা কোনো বিশেষ যুগ বা কালের জন্যে রচিত হয়নি বরং সর্বকালের মানুষের মুক্তির দিশা তাতে রয়েছে। তাই তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষানীতি সার্বজনীন ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই চিরন্তন শিক্ষানীতির বিকল্প কোনো শিক্ষানীতি মানবতার জন্যে সর্বাংগীন কল্যাণবহ হবেনা। তাঁর দেয়া শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শাশ্বত ও সার্বজনীন শিক্ষাদর্শ। তাঁর শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলা

রসূলের শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হলো, জ্ঞানের প্রকৃত উৎস আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ ও বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিক ঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ– (الملك : ٢٦، الاحقاف : ٢٣)

"হে নবী বলো ঃ আল্লাহ্ই সমস্ত জ্ঞানের মালিক" [সূরা মুলক ঃ ২৬, আহকাফ ঃ ২৩]

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ– (النساء : ٢٦)

"আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময় [সূরা নিসা ঃ ২৬]

গোপন প্রকাশ্য, দৃশ্য অদৃশ্য, মূর্ত বিমূর্ত সব কিছুর জ্ঞান তাঁর কাছে রয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই কাছে আছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী।" [সূরা হাশর ঃ ২২]

মানুষ এতোই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে, তাঁর অসীম জ্ঞান সীমার নাগালের ধারে কাছেও পৌঁছুতে সক্ষম নয়। তবে তিনি ইচ্ছে করে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে কেবল ততোটুকু জানে ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ-

"তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কোনো কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্ত্বাধীন করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু চান।" [সূরা বাকারা ঃ ২৫৫]

মানুষকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। তবে মানুষকে তিনি সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন ঃ

وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا- (الاسراء : ٨٥)

"তোমাদেরকে জ্ঞানের কোনো অংশ দেয়া হয়নি, তবে সামান্য মাত্র।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫]

তাই, মানুষের কর্তব্য তাঁর কাছেই জ্ঞানের জন্যে আরাধনা করা ঃ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا- (طه : ١١٤)

বলো ঃ "প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

২. জ্ঞানের মূলসূত্র অহী ও নবূয়্যত

জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী ও নবূয়্যত। আল্লাহ্ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের মধ্য থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তিকে নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাদের কাছে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে তিনি মানবতার মুক্তির জন্যে পূর্ণ জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। যে পদ্ধতিতে নবীর কাছে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম 'অহী'। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবার কারণে তাঁর মাধ্যমে অবতীর্ণ শিক্ষা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ শিক্ষা আমাদের কাছে দুইভাবে

সংরক্ষিত আছে। এক, কুরআনের মাধ্যমে। দুই, হাদীস বা সুন্নাতে রসূলের মাধ্যমে। কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ। একেকটি শব্দসহ গোটা গ্রন্থটি সন্দেহ সংশয়ের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দ হুবহু [as it is] আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ হচ্ছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অনাবিল সূত্র। হাদীস মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। কুরআনকে নবূয়্যতি পন্থা ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাদীসের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। তাই ইহজগত ও পরজগতের সর্বাংগীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যি জ্ঞানের এই মূল সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এছাড়া বিকল্প নেই।

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ- (الانعام :١٩)

"এই কুরআন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেনো আমি এর সাহায্যে তোমাদের সতর্ক করতে পারি। [সূরা আন'আম ঃ ১৯]

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِن لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ، (النمل :٦)

"নিঃসন্দেহে তুমি এই কুরআন এক মহাবিজ্ঞ সর্বজ্ঞানী সত্তার নিকট থেকে লাভ করছো।" [সূরা নামল ঃ ৬]

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، (النساء : ١١٣)

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন আর তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিলোনা।" [সূরা নিসা ঃ ১১৩]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُالْمُؤْمِنِيْنَ،

"এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা সম্পূর্ণ সরল সোজা ও ঋজু। আর যারা একে মেনে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৯]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٌ مِنَ الْهُدٰى - (البقره : ١٨٥)

"রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এতে গোটা মানব

জাতির জন্যে রয়েছে জীবন যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট শিক্ষায় পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে। [সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫]

৩. আসল শিক্ষক নবী নিজে

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তার মূল শিক্ষক রসূল নিজেই। কী শিক্ষা দিতে হবে? শিক্ষানীতি কী হবে? শিক্ষা ব্যবস্থা কী হবে? কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করতে হবে? এসব ব্যাপারে রসূল নিজেই আদর্শ। তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণ করতে হবে তাঁরই পদাংক ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ- (الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা। ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী।" [সূরা আহযাব ঃ ২১]

তিনি শুধু নমুনাই নন। বরঞ্চ মুমিনদের পক্ষে তাঁর নমুনা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জীবনের সবকিছু গ্রহণ বর্জন করতে হবে কেবল তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

"রসূল তোমাদের যা দেয় তাই গ্রহণ করো আর যা বর্জন করতে বলে, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা হাশর ঃ ৭]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-

"হে নবী! তাদের বলো ঃ তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, তবে আমাকে অনুসরণ করো।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১]

৪. আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাহলো মানুষ বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালক এক লা-শরীক আল্লাহ্‌র দাস। তাঁর দাসত্ব করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর দাস মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ- (الزاريات : ٥٦)

"আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমার দাসত্ব করার জন্যে।" [সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬]

এই দাস মানুষকে পৃথিবীতে যে তাঁর প্রতিনিধিও নিযুক্ত করবেন, একথা মানুষকে সৃষ্টি করবার প্রাক্কালেই তিনি ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً-

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন ঃ পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি বানাবো।" [সূরা আল বাকারা ঃ ৩০]

মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে তাকে আল্লাহ্‌র সত্যিকার দাস ও প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতির মূল কথা। আর এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুয়্যতি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য 'আদর্শ নাগরিক তৈরি' নয়, 'আদর্শ মানুষ তৈরি'।

এই শিক্ষানীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো, মানুষ এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। রসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের [দীন ও শরীয়ার] ভিত্তিতে তাঁর দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যেই কাজ করবেনা, বরঞ্চ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ,মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আদালতে আখিরাতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিণতিতে চিরকাল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গেলে পরকালে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে। চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবে-এ অনুভূতি নিয়েই দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবেই মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে 'আদর্শ মানুষে' পরিণত হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ- (البقره : ٢٠٧)

"আরেকটি মানব দল আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের জান প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। মূলত, আল্লাহ্‌ তাঁর এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২০৭]

মানুষকে এভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ।

৫. পূর্ণাংগ জীবন ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষা

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষা মানব জীবনের কোনো একটি বা দুটি দিকের জন্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়। বরঞ্চ তাঁর শিক্ষা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত। আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত শিক্ষার প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়। এই একমুখী বস্তুগত শিক্ষাই বর্তমান বিশ্বের সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ। আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পূর্ণাংগ জীবন ভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চায়। তাই ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথিদের একই সাথে আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি। সমন্বয় করেছেন। সবগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি। বরঞ্চ একটি এককের অধীন করেছেন। মূলত জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনাকে বিকশিত করতে পারলেই মানুষ 'আদর্শ মানুষে' পরিণত হতে পারে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ-اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ- (البقره : ١٧٧)

"পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো আসল পূণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পূণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আল কিতাব ও নবীদের প্রতি আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাবার জন্যে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে। তাছাড়া সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পূণ্যবান লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দারিদ্র দুঃসময়, দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপদ ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অটলতা অবলম্বনকারী। এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী আর এরাই ন্যায়বান আদর্শ মানুষ।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রকম সত্যপন্থী ন্যায়বান আদর্শ মানুষই তৈরি করেছিলেন। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করে দিয়েছিলেন তিনি তার সর্বাংগীন পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ শিক্ষা মানুষকে কেবল বৈষয়িক দিক থেকেই যোগ্য করেনা, পরকালীন সাফল্যও প্রদান করে। তাইতো নবীর ছাত্ররা তাদের মনিবের দরবারে উভয় জগতের সাফল্য ও কল্যাণের ফরিয়াদ করেঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- (البقره : ٢٠١)

"আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান করো। আর পরকালের কল্যাণও দান করো এবং আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সূরা বাকারাঃ২০১]

বস্তুত এই শিক্ষানীতির পূর্ণাংগতার কারণেই নবীর সাথিরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব দলে পরিণত হয়েছিলেন।

৫

রসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষাদান পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের নিকট যে শিক্ষা নাযিল করেছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সেরা মানব দল তৈরি করেছেন, রসূল নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন ঃ

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا – "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" [দারমি]

রসূলের শিক্ষা দানের ধারা পদ্ধতি

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেই একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। হাদীস থেকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তা কুরআন থেকে লাভ করা ধারণাকে ব্যাপক প্রশস্ত করে। আমরা খুঁটিনাটি আলোচনা পরিহার করে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কুরআন হাদীস ভিত্তিক একটি মৌলিক তথ্য এখানে পেশ করছি। প্রথমেই তাঁর শিক্ষা দান সংক্রান্ত বিখ্যাত আয়াতটি পেশ করছি। আয়াতটি কুরআনের একাধিক স্থানে পুণরুল্লেখ হয়েছে ঃ

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- (البقره : ١٥١)

"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদের আল কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতেনা তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

এ আয়াত থেকে আমরা রসূলের শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মৌলিক দিকগুলো লাভ করি, সেগুলো হলো ঃ

ক. তিনি কুরআন পাঠ করে শুনাতেন ঃ যেহেতু কুরআন লিখিত আকারে নাযিল হয়নি, তাঁকে অবশ্যি পাঠ করে শুনাতে হতো। এটা শুনানের জন্যই শুনানো ছিলনা। মূলত এটা ছিলো তাঁর পাঠদান।

খ. তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করতেন ঃ অর্থাৎ তাদের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে তাওহীদি ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব ভ্রান্তি ছিলো, সেগুলো সংশোধন করে দিতেন। শুধু তাই নয়, সেই সাথে তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতেন। আর কেবল পরিশুদ্ধির কাজই তিনি করেননি, সেই সাথে তাদের আত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক প্রতিভাসমূহকেও তিনি পূর্ণ বিকশিত করে দিয়েছেন।

গ. আল কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন ঃ আল কিতাব মানে আল কুরআন। অর্থাৎ তিনি তাদের পরিশুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে যে কাজ করেছেন, তা করেছেন তাদেরকে আল কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে। এ মহা গ্রন্থই সংস্কার সংশোধন ও মানব প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ।

ঘ. তাদেরকে কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন ঃ কুরআনে হিকমাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হিকমাহ মানে কর্মকৌশল, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কৌশল। অর্থাৎ নবী কুরআন তথা অহীর মাধ্যমে তাঁর সাথিদেরকে যেসব শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী প্রদান করতেন, সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্যকর করার যোগ্যতা, দক্ষতা এবং কর্মকৌশলও তাদের শিক্ষা দিতেন। সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈষয়িক জীবনের সকল দিক

ও বিভাগ পরিচালনার দক্ষতা সৃষ্টি কর্মকৌশল বা হিকমাহ শিক্ষা দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৬. যা তারা জানতোনা তাও তাদের শিক্ষা দিতেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন, তারা ছিলো অসভ্য, কুসংস্কারে বিশ্বাসী। চালচলন ছিলো নোংরা অপরিচ্ছন্ন। সদাচার তারা জানতোনা। পবিত্রতার ধার ধারতোনা। উত্তম সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক তারা ছিলোনা। রসূল তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা দেন। সুন্দর অমায়িক আচার আচরণ শিক্ষা দেন। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেন। এভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন।

এ হলো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি দিক। এ দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যারা বিশ্বমানবতাকে শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে চিরন্তন কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে চাইবেন, রসূলে করীমের এই শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে তাদের জন্যে বিরাট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

শিক্ষকের দায়িত্ব

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, রসূলের শিক্ষকতা পৃথিবীর প্রচলিত শিক্ষকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পৃথিবীর সাধারণ শিক্ষকরা শুধু জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার [Transfar] দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, রসূলের অবস্থা তা নয়। তিনি জ্ঞান দান করতেন এবং সাথে সাথে জ্ঞানের ভিত্তিতে আত্মা, মন ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাঁর ছাত্রদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ ও পরিগঠিত করে তোলেন। তিনি শুধু জ্ঞানের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যাই প্রদান করতেননা। বরং সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার আলোকে বিনির্মানের কাজও করতেন। এর কারণ, তাকে যে শিক্ষা নিয়ে পাঠানো হয়েছে তা শিক্ষাদান ও বাস্তবায়ন উভয় দায়িত্বই তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল ঃ

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ- (توبه : ٣٣)

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি তাঁর রসূলকে সঠিক পথের শিক্ষা ও সত্য জীবন যাপনের বিধানসহ পাঠিয়েছেন যেন তা সে অন্য সকল বিধানের উপর বিজয়ী করে দেয়।" [সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩]

যেহেতু আদর্শের শিক্ষাদান ও তা বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িত্বই নবীর উপর

অর্পিত হয়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে লোক তৈরি করতে হয়েছিল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল জ্ঞান Transfar করাই নয়, বরং জ্ঞানের আলোকে লোক তৈরি করাও তার সমান দায়িত্ব।

শিক্ষকের প্রস্তুতি

শিক্ষা দানের জন্যে শিক্ষকের প্রথম কাজ হলো নিজের প্রস্তুতি। আর রসূল যেহেতু জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাস্তবরূপ অর্থাৎ চরিত্রেরও শিক্ষক ছিলেন, সে জন্যে উভয় প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণও ছিলো তাঁর জন্যে অপরিহার্য। শুধু প্রস্তুতিই নয়, বরং শিক্ষককে তো হতে হবে মডেল। জ্ঞানের দিক থেকে পরিপূর্ণ বুঝ এবং চরিত্রের নিখুঁত পূর্ণতা শিক্ষকের জন্যে অপরিহার্য। আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা বিশ্বমানবতার মূল শিক্ষক, সে জন্যে তাঁর প্রস্তুতিরও প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক। আর বাস্তবেও তাঁর উভয় প্রকার প্রস্তুতিতে কোনো প্রকার ঘাটতি ছিলোনা। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি দোয়া করতেন ঃ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا - (طٰهٰ : ١١٤)

"প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান করো।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

জ্ঞানের প্রতি তাঁর এতোই আকর্ষণ ছিলো যে, যখনই অহী নাযিল হতো, তিনি তা দ্রুত মুখস্ত করে নেয়ার জন্যে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে থাকতেন। এমন কি তাঁর এ অবস্থাকে অহীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ - (القيامه : ١٦)

"অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্যে তোমার যবানকে আন্দোলিত করোনা।" [সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬]

তবে অধ্যয়নের ব্যাপারে আসমানি তাকীদ অব্যাহত ছিলো ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا- (المزمل : ٤)

"কুরআন পাঠ করতে থাকো ধীরে সুস্থে।" [সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ- (العنكبوت : ٤٥)

"তোমার কাছে প্রেরিত কিতাব পাঠ করতে থাকো।" [আনকাবূত ৪৫]

গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন পূর্ণমাত্রায়। স্বয়ং তাঁর প্রভু তাঁর প্রস্তুতির স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ- (المزمل : ٢٠)

"তোমার প্রভু জানেন, তুমি কখনো রাতের দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধরাত, আবার কখনো রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাকো।" [সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০]

রসূল কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন?

রসূলে করীমের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়, প্রভাবশীল ও কার্যকর। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

এক. মৌখিক পদ্ধতি,

দুই. বাস্তব পদ্ধতি।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا- (الاحزاب : ٤٥)

"আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আহযাব ঃ ৪৫]

এ আয়াতে নবীর শিক্ষা দান ও শিক্ষা প্রচারের পদ্ধতির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি শিক্ষা দিতেন ঃ

ক. নিজেকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে,

খ. সুসংবাদ দানের মাধ্যমে,

গ. সতর্ক করার মাধ্যমে,

ঘ. আহ্বান করার মাধ্যমে,

ঙ. যে উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করছেন, নিজেকে তার মূর্তপ্রতীক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পেশ করার মাধ্যেমে।

এখানে 'ক' ও 'ঙ' পয়েন্ট থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, নবী যে শিক্ষা প্রদান করতেন, নিজেকে তার বাস্তব সাক্ষী ও মূর্তপ্রতীক হিসেবেও পেশ করতেন। আর এটাই ছিলো তাঁর শিক্ষাদানের সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি।

ক. শিক্ষা দানের বাস্তব পদ্ধতি

শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতিকে চারিত্রিক পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। নবী তাঁর সাথিদেরকে সারা জীবনে এমন একটি কথাও শিক্ষা দেননি, যেটি তিনি নিজের জীবন ও চরিত্রে বাস্তবায়ন করেননি। বরঞ্চ তিনি তাদের যা কিছু মৌখিক শিক্ষা দিতেন, সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখিয়ে দিতেন। আর এটাই ছিলো তাদের জন্যে সবচাইতে বড় শিক্ষা। মূলত জ্ঞান হলো বিশ্বাস বা ঈমান। আর জ্ঞানের বাস্তবরূপ 'আমলে সালেহ'। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ছিলেন জ্ঞান ও ঈমানের শিক্ষক আর অপর দিকে ছিলেন আমলে সালেহ্র মূর্তপ্রতীক। তাঁর সাথিরা তাঁর কাছে শুনে শুনে মৌখিক [Theoritical] জ্ঞানার্জন করতো আর তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে দেখে বাস্তব [Practical] শিক্ষা গ্রহণ করতো। তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বলেছেন ঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ-

"তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।"

এক কিশোরের মা তাঁর কাছে এসেছিল তার সন্তানকে মিষ্টি বেশি না খাবার উপদেশ দিতে। কিন্তু তিনি এ উপদেশ দেবার জন্যে সময় চেয়ে নেন। অতপর তিনি নিজের মিষ্টি খাবার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কিছুদিন পর কিশোরটিকে মিষ্টি কম খাবার উপদেশ দেন।

তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে এলে তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাদের বলে দেন, তাঁর জীবন ছিলো কুরআনেরই বাস্তবরূপ। এজন্যেই তিনি বলেছিলেন ঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ- (موطا امام مالك)

"উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।" [মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক]

আর তিনি যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন, সে স্বীকৃতি স্বয়ং তাঁর প্রভুই তাকে দিয়েছেন ঃ

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ– (القلم : ٤)

"তুমি অবশ্যি নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।" [সূরা ক্বলম ঃ ৪] সাথিদের সামনে উচ্চ নৈতিক চরিত্র পেশ করার মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দান করেছিলেন, তাদের মন জয় করেছিলেন এবং তাদেরকেও আদর্শ মানবদল হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা।

খ. মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদানের যতো প্রকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথিদেরকে এসব পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করতেন। বরং তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো আরো প্রশস্ত ও কার্যকরী। আমরা এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরবো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বলতেন। প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন। কথা অনর্গল বলে যেতেননা, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতেন। তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখনো এভাবেই পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বিরতি দিয়ে দিয়ে শিক্ষা দিতেন। অনবরত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করে যেতেননা। তাঁর বক্তব্য শোনা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। আর এটা ছিলো তাঁর প্রতি কুরআনেরই নির্দেশ ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا– (بنى اسرائيل : ١٠٦)

"এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদের শুনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা ক্রমশ নাযিল করেছি।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬]

এ প্রসংগে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। জনৈক তাবিয়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ প্রতি বিষ্যুদবারে লোকদের শিক্ষা প্রদান করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রতিদিন শিক্ষা প্রদানের অনুরোধ করেন। এর জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমাদের বিরক্তির আশংকায় এ কাজ থেকে আমি বিরত রয়েছি ঠিক সেভাবে, যেভাবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্তি উদ্রেক হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

অপর এক হাদীসে ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, সাপ্তাহে একবার উপদেশ দান করো, অথবা দুইবার কিংবা খুব বেশি করলে তিনবার। [বুখারি]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। শ্রোতাদের ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতেন। কারো সাধ্যের বাইরে তাকে কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিতেননা। তিনি তাঁর সাথিদের বলতেন ঃ

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلاَثًا وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ-

"মানুষকে শিক্ষাদান করো এবং লোকদের সামনে সহজ করে পেশ করো [কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন]। আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে তখন চুপ থাকবে।" [আদাবুল মুফরাদ ঃ ইবনে আব্বাস]

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণ। তিনি কখনো তাঁর সাথিদেরকে নিরাশ করতেননা। তাদের অকল্যাণ হবে এমনসব ব্যাপারে তাদেরকে সবসময় সতর্ক করতেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকেও বলতেন, মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিওনা। একটু আগে সূরা আহযাবের পঁয়তাল্লিশ আয়াতেও আমরা দেখেছি, আল্লাহ্ তাঁকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছেন।

বক্তব্য পেশ করার আগে তিনি শ্রোতাদের মনোযোগ পূরোপুরি আকৃষ্ট করে নিতেন। এ জন্যে আবার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কখনো ব্যক্তির নাম

ধরে ধরে সম্বোধন করতেন। কখনো কোনো সতর্ককারী বক্তব্য উচ্চারণ করতেন। কখনো একটি কথা একাধিক বার [Repeat] করতেন।

কখনো পারস্পরিক কথপোকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। কখনো শিক্ষা দিতেন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে। অবার কখনো শিক্ষা দিতেন বক্তৃতার মাধ্যমে। কখনো একটি সম্বোধন বা শব্দ উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। শ্রোতারা পরবর্তী কথাটি শুনার জন্যে গভীর আকর্ষণের সাথে মনোযোগ নিবদ্ধ করতো। অতপর তিনি মূল বক্তব্য পেশ করতেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মানুষের কাছে দীনের শিক্ষা পেশ করতেন। আর এভাবে পেশ করার নির্দেশই তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

"তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকো বিজ্ঞতার সাথে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায়।" [সূরা আন নহল ঃ ১২৫]

মুসলিম শাসনামলে উমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

১. আভাস

৬২২ ঈসায়ি সালে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা সেখান থেকেই। মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শিক্ষক। সাহাবায়ে কিরাম প্রথম ছাত্রসমাজ।

এখান থেকেই সম্মুখে অগ্রসর হয় উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষার ইতিহাস।

অতপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীর লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানবতার দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র। সেখানেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো। এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণ চাঞ্চল্য।

ইসলামের এ সুমহান সভ্যতা সংস্কৃতির জোয়ারেই প্লাবিত হয়েছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ হিন্দুস্তান। ব্যাপকভাবে এসেছেন এখানে ইসলামের পতাকাবাহীরা। তাঁরা এসেছেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে। তাঁরা এসেছেন কখনো বীরের বেশে, কখনো দরবেশের বেশে। তাঁরা ছড়িয়ে

পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে। ব্যক্তিগত ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজারো শিক্ষাকেন্দ্র। সেসব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য শাসক ও কর্মচারী, সৈনিক ও সেনাপতি, ফকীহ ও আলেমে দীন এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। মোটকথা, একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার দক্ষ লোকই সে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তৈরি হয়েছিল।

২. উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও শাসন

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে হাজারো মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এমনকি মুসলমান আরব ব্যবসায়ীরাও এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। উমাইয়া খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে [৭০৫-৭১৫ খৃঃ] সেনাপতি ইমাদ উদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসেম সাকাফি সর্বপ্রথম [৭১২-১৩ খৃঃ] ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন। অতপর গযনীর সুলতান সবুক্তগীন [৯৭৭-৯৭ খৃঃ] এবং তাঁর পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মাহমুদ [৯৯৮-১০৩০ খৃঃ] পূর্বদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত গযনীর ইসলামী রাজ্যকে বিস্তৃতি করেন। এরপরে বিভিন্ন সময় নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা গোটা ভারতবর্ষ অধিকার করে নেন। এদেশে দিল্লী কেন্দ্রিক প্রথম স্বাধীন ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দীন আইবক [১২০৬-১০ খৃঃ]। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ শাসক ছিলেন মুগল বংশের সম্রাটগণ। তাঁদের শাসন যুগের শেষদিকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজরা বাংলাদেশ দখল করে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা রাজধানী দিল্লী দখল করে মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তাদের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত করে। সর্বশেষ ইংরেজ বৃত্তিভোগী মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের [১৮৩৭-৫৭ খৃঃ] আমলে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং বিপ্লবীগণ কর্তৃক তাকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করায় ইংরেজরা তাঁকে রেংগুনে নির্বাসিত করে এবং তাঁর সন্তানদের দিল্লীর রাজপথে গুলী করে হত্যা করে।

এদেশে ইংরেজদের হাতে এভাবে মুসলমানদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। গোটা মুসলিম ভারত করায়ত্ব করতে তাদের একশত বছর সময় লাগে।

৩. উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কয়েক শতাব্দীকালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব সাধন করেন। ১৮৮২ সালে ইংরেজদের এক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয় ঃ

> "আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর তারা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করে। ধর্মই তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ হবার কারণে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াক্‌ফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দীনদার লোকেরা পারলৌকিক পূণ্য লাভের জন্যে ওয়াক্‌ফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যান। পাক ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসার এ অবস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবত থাকে।"

উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠার একটা চিত্র এ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অবশ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাসেম মাহমুদের শাসনামল থেকে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়।

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম লিখেছেন ঃ

> "৫৮৯ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানে মুয়েযুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাম [শিহাবুদ্দীন গোরী নামে খ্যাত] কর্তৃক ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়। তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ জ্ঞানপ্রিয় বাদশাই সর্ব প্রথম দিল্লীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদ্রাসার নামকরণ হয়, 'মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়া'। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবক [১২০৬-১২ খৃঃ] আজমীরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাকে 'আড়াই দিনের ঝুপড়ি' বলা হতো। তৃতীয় মাদ্রাসাটি মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসীরুদ্দীন কুবাচা 'উচে' প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযি মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানি

[মৃত্যু ১২৬০ খৃঃ] সর্ব প্রথম উচ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে তিনি মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন।"

অতপর মুসলিম শাসক, আলেম, আমীর ও বিদ্যোসাহী দীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে মক্তব মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী ঃ

"সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের [১৩২৫-৫৯ খৃঃ] আমলে দিল্লীতে এক হাজার মাদ্রাসা ছিলো। এর মধ্যে শাফেয়ি মাযহাবের লোকদের একটা মাদ্রাসা ছিলো। শিক্ষকদের সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হতো। মাদ্রাসাগুলোতে দীনি শিক্ষার সাথে সাথে অংক এবং দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাও দেয়া হতো।"

রোহিলা খন্ডের হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের [মৃত্যু ১৭৭৪ খৃঃ] জীবন চরিত থেকে জানা যায় ঃ

"দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবলমাত্র রোহিলা খন্ড জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঁচ হাজার আলিম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা নিয়মিত ভাতা পেতেন।"

এস, বসুর 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ঃ

"ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার মকতব ছিলো।" [ম্যাকস মুলারের শিক্ষা রিপোর্ট]

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিল

মুসলিম শাসনামলে এদেশে বিভিন্ন সময় নানা প্রকার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মকতব ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠে।

১. কখনো ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কল্যাণধর্মী কাজ হিসেবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং খরচ বহনের জন্যে মাদ্রাসার নামে সম্পত্তি ওয়াক্ফ দিতেন। এ সম্পত্তি থেকেই শিক্ষক ও ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো। ছাত্রদের শিক্ষা ও জীবিকার যাবতীয় ব্যয় মাদ্রাসা থেকেই বহন করা হতো।

২. অনেক সময় কোনো আলিম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। তিনি নিজেই শিক্ষক নিয়োগ করতেন ছাত্রদের শিক্ষা ও খাবার ব্যয় নির্বাহ করতেন।

৩. কখনো কোনো ধনী ব্যক্তি নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিয়োগ করতেন। ঐ শিক্ষককে কেন্দ্র করে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মাদ্রাসা আকার ধারণ করতো। শিক্ষক নিয়োগকারী নিজেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।

৪. কখনো আবার যোগ্য আলিমকে কেন্দ্র করে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর পাশে জড়ো হতো। লেখাপড়া চলতো মসজিদে। ছাত্ররা লজিং থাকতো এবং শিক্ষকগণ থাকতেন মসজিদের হুজরায়।

৫. কোনো কোনো সময় শাসকগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তারাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

এমনিভাবে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় অসংখ্য মকতব মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। এটা ছিলো শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের নজীরবিহীন আগ্রহের ফল।

৫. মাদ্রাসা গৃহ

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়েক শতাব্দী যাবত মসজিদই মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রথম স্বতন্ত্র গৃহ কখন এবং কোথায় নির্মিত হয়েছিল সে ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা বড় মুশকিল। তবে যতোটুকু জানা যায়, এদেশে মুসলমানদের চার প্রকার শিক্ষা কেন্দ্র ছিলো ঃ

১. মসজিদ,
২. মাদ্রাসা ও মকতবের স্বতন্ত্র গৃহ,
৩. কোনো আমীর বা ধনী ব্যক্তির বসতবাটির অংশ বিশেষ এবং
৪. কোনো গাছের নিচে।

৬. মাদ্রাসার আসবাবপত্র

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম তাঁর 'হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা নিযামে তা'লীম ও তারবিয়াত গ্রন্থে' মুসলিম শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আসবাবপত্র সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হতো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের। বালকদের বসার জন্যে থাকতো চাটাইয়ের বিছানা; কিতাবপত্র রাখার জন্যে ভূমি থেকে অল্প উঁচু কাষ্ঠখন্ড; শিক্ষকের বসার জন্যে গদীর আসন। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকাদি এবং সামান্য কাষ্ঠ সামগ্রীর সমন্বয়ে গঠিত হতো গোটা প্রতিষ্ঠান। টেবিল চেয়ার তো সে সময় নবাবদের বাড়ীতেও পাওয়া যেতোনা। ইংরেজদের

বিজয়ের পরই এসবের প্রচলন শুরু হয়। অপ্রয়োজনীয় কোনো আসবাবপত্র মাদ্রাসায় থাকতোনা। অতিশয় মিতব্যয়ীতা ও সাদাসিধে ভাবে কর্ম সম্পাদন করা হতো। এ কারণে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা খুবই সহজ ছিলো।

৭. শিক্ষার কাঠামো

মুসলিম শাসনামলে এদেশে শিক্ষা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলোনা। পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়নেও সরকারের কোনো হাত ছিলোনা। উলামায়ে কিরাম এবং শিক্ষকগণই ঠিক করতেন কি পড়াবেন। তাই সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষানীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতোনা। তবে শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ একটি বুনিয়াদি কাঠামো গড়ে ওঠে।

১. **মকতব ঃ** এতে কুরআন পাঠ ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো।

২. **ফার্সি মাদ্রাসা ঃ** এতে ফার্সি ভাষা এবং এ ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করা হতো।

৩. **আরবি মাদ্রাসা ঃ** মূলত আরবি মাদ্রাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। এতে আরবি ভাষা ও দীনি ইলমের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো।

৮. ভর্তি

মকতব এবং ফার্সি মাদ্রাসাসমূহে ভর্তির ব্যাপারে তেমন কোনো নিয়মনীতি পালন করা হতোনা। যখনই কেউ লেখা পড়া করতে আসতো তাকে পাঠে শরীক করে নেয়া হতো। আরবি মাদ্রাসাগুলোতে অবশ্য ভর্তির সময় ছিলো শাওয়াল মাস। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে একমাস পরেও ভর্তি করা হতো।

৯. ভর্তির বয়স

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে বয়সের কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। যখনই কোনো ব্যক্তির বোধোদয় হতো তখনই সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারতো। মাদ্রাসাগুলো তাকে সহযোগিতা করতো। বয়সের ভিত্তিতে কোনো তারতম্য করা হতোনা। কেউ কেউ অধিক বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতেন। সাধারণভাবে মাদ্রাসাগুলোতে বালকদের সাথে বয়স্কদেরও দেখা যেতো।

১০. শ্রেণী বিন্যাস

সে সময় মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণী বিন্যাস পন্থা ছিলোনা। শিক্ষার কাল বছর দ্বারা গণনা না করে পাঠ্য পুস্তক দ্বারা করা হতো। বলা হতো এ ছাত্র অমুক অমুক কিতাব পড়েছে, বা অমুক অমুক কিতাব পড়া বাকি আছে। প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক সবক [পাঠ] দেয়া হতো। প্রত্যেকের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি রাখা হতো। কেউ কেউ দ্রুত কিতাব শেষ করতে পারতো। আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন একই কিতাব নিয়ে পড়ে থাকতো। সকল ছাত্র একত্রে বসে তাদের পাঠ মুখস্থ করতো।

১১. শিশু শিক্ষার সূচনাকাল

শিক্ষিত মুসলিম পরিবারসমূহে প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চলে আসছিল যে, তাদের সন্তানরা যখন চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে উপনীত হতো, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শিক্ষাদান শুরু হতো। এ অনুষ্ঠানকে 'বিসমিল্লাহর অনুষ্ঠান' বলা হতো। এটা একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হতো। অভিভাবকগণ তাদের বন্ধু বান্ধবদের এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতেন। সন্তানের শিক্ষার সূচনার জন্যে কোনো বুযর্গ আলিমকে দাওয়াত দেয়া হতো। তিনি "রাব্বি ইয়াস্‌সির ওলা তু'আসসির ওয়া তাম্‌মিম বিল খায়ির, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়িয়ে অতপর সূরা আলাকের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত এবং সূরা ফাতিহা পড়িয়ে দিতেন। শিশু এ পাঠ আওড়াতে থাকতো। উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হতো। অভিভাবকের সামর্থানুযায়ী অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইনাম পেতেন।

১২. শিক্ষার সময়সূচি

মকতব ও মাদ্রাসাগুলোতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হয়ে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত তা অব্যাহতভাবে চলতো। অবশ্য আরবি মাদ্রাসাগুলো আসর পর্যন্ত চলতো। মাঝখানে যোহরের নামায ও খাবারের বিরতি হতো। কোনো কোনো শিক্ষক চূড়ান্ত পর্যায়ের ছাত্রদের এশা ও তাহাজ্জুদের পরও পড়াতেন। পড়া লেখার যাবতীয় কাজ মাদ্রাসাতেই সম্পন্ন করা হতো।

১৩. সাপ্তাহিক ছুটি

শুক্রবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বৃহস্পতিবারে অর্ধদিবস পর্যন্ত মাদ্রাসা খোলা থাকতো। এ সময়টাও মসজিদ বা মাদ্রাসার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে

ব্যয় হতো। কোনো কোনো আরবি মাদ্রাসায় মঙ্গলবারে পাঠদান হতোনা। সেদিন ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের কপি তৈরি করতো। শিক্ষকগণ গ্রন্থ রচনার কাজ করতেন।

১৪. বার্ষিক ছুটি

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় সারা বছরই পড়ালেখা চলতো। ছুটি থাকতো খুবই কম। বার্ষিক ছুটি মোটামুটি নিম্নরূপ ছিলো ঃ

১. ঈদুল ফিতর	২ দিন
২.ঈদুল আযহা	৫ দিন
৩. মুহাররম	৬ দিন [বাংলাদেশে]
৪. সফর মাসের শেষ বুধবার	১ দিন [বাংলাদেশে]
৫. শবে বরাত	১ দিন
মোট	১৫ দিন।

১৫. খেলাধূলা

বর্তমান যুগের মতো তখন খেলাধুলার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতোনা। খেলাধুলায় সময় অপচয় করতে নিষেধ করা হতো। মাদ্রাসাগুলোতে খেলাধূলার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিলোনা। অবশ্য কোথাও কোথাও ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে ব্যায়াম করতেন। কোথাও কোথাও যুদ্ধ বিদ্যার প্রশিক্ষণ হতো। ইমাম গাযালি প্রমুখ শিশুদের জন্যে খেলাধূলা অপরিহার্য মনে করতেন।

১৬. শাস্তি

শিষ্টাচার বা আদব শিক্ষাদানের জন্যে সে যুগে শাস্তি বা দন্ড প্রদানকে শিক্ষার অপরিহার্য অংগ মনে করা হতো। এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যাপারেও ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হতো। ভর্তির সময় অভিভাবকগণ বলে যেতেন ঃ 'হাড় আমাদের শরীর আর চামড়া আপনাদের। কোনো কোনো শিক্ষক দন্ডদানে বিশেষভাবে খ্যাতিমান হয়ে উঠতেন। বেয়াড়া এবং পলাতক ছাত্রদের খুঁজে বের করে পিটাতে পিটাতে মাদ্রাসায় আনা হতো। শিক্ষাকে তখন কোনো ঐচ্ছিক ব্যাপার মনে করা হতোনা। বরং শিক্ষা ছিলো আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক। তাই লেখা পড়ায় ছাত্রদের সামান্যতম অলসতাও কঠোর দৃষ্টিতে দেখা হতো।

১৭. খাদ্য

মাদ্রাসায় খানা পাকানোর ব্যবস্থা ছিলোনা। এলাকাবাসীরাই ছাত্রদের খাবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতো অথবা মাদ্রাসায় এনে ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে একত্রে খাবার খেতো।

১৮. থাকা

স্থানীয় ছাত্রদের বলা হতো মুকীম। দূরাগত ছাত্রদের বলা হতো মুসাফির। মুসাফির ছাত্ররা মাদ্রাসা কক্ষে কিংবা মসজিদের হুজরায় থাকতো। চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়তো। লজিং থাকার প্রথাও ছিলো।

১৯. শিক্ষা সমাপন

মেধাবী ছাত্ররা ১৪/১৫ বছর বয়সেই ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপন করতো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবি পনের বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করেন। যাদের মেধাশক্তি কম ছিলো, শিক্ষা সমাপন করতে তাদের আরো কয়েক বছর বেশি সময় লাগতো।

২০. সমাবর্তন [CONVOCATION]

সকল ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। এতে বড় বড় আলিমদের দাওয়াত দেয়া হতো। সেখানে 'ফাতিহা' পাঠ করে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের জন্যে দোয়া করা হতো। অতপর কোনো একজন বুযর্গ তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করতেন। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে 'ফাতিহা ফেরাগ' বলা হতো।

২১. উপাধি

সে আমলে ফার্সি মাদ্রাসা সমাপনকারীকে 'মুন্সি' এবং আরবি মাদ্রাসা সমাপনকারীকে 'আলিম' খেতাব দেয়া হতো। মুগল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম হাসিলকারীকে 'দানিশ মন্দ' বলা হতো। মাওলানা গোলাম আলী আযাদের [মৃত্যু ১৭৮৫ খৃঃ] যামানায় দানিশ মন্দের পরিবর্তে 'মৌলভী' খেতাব চালু হয়। ফার্সি মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর ছাত্ররা সরকারি চাকুরীর উপযুক্ত বিবেচিত হতো।

২২. শিক্ষক

ফার্সি মাদ্রাসা শিক্ষকদের 'মিয়াজি' 'আখন্দজি' কিংবা 'মোল্লাজি' বলা হতো। আরবি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বলা হতো 'মৌলভি' কিংবা 'মোল্লা সাহেব'।

২৩. সর্দার পড়ুয়া [MONITOR]

মুসলিম শাসনামলে নামকরা আলিমদের শিক্ষাকেন্দ্রে এ প্রথা ছিলো যে, তারা কোনো উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রকে 'সর্দার পড়ুয়া' নিয়োগ করতেন। উস্তাদ যা পড়িয়ে যেতেন সে তার পুণরালোচনা ও ব্যাখ্যা করতো। এরূপ ছাত্রকে 'মূয়ীদ' বা 'মন্‌সবদার' বলা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বোম্বাইতে নিযুক্ত DR. ANDREW BELL নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীর 'সর্দার পড়ুয়া' সংক্রান্ত এ প্রথা খুবই পছন্দ হয়। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে MONITOR নাম দিয়ে 'সর্দার পড়ুয়া' সংক্রান্ত এ প্রথা সেখানে চালু করেন। সেখান থেকে পুণরায় এদেশের আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সে প্রথা আমদানি হয়।

২৪. পাঠ্য বিষয়

আগেই বলেছি, শিক্ষা বিভাগ বলে সরকারের তখন কোনো বিভাগ ছিলোনা। শিক্ষানীতি ও শিক্ষার বিষয় প্রণয়নে সরকারের কোনো হাত ছিলোনা। বড় বড় আলিম ও শিক্ষকগণই এ দায়িত্ব পালন করতেন। শিক্ষানীতি, পাঠ বিষয়, পাঠ্য তালিকা তারাই প্রণয়ন করতেন। শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারি হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা বরং বহু শাসক ও সুলতানদের প্রশাসনেই আলিমদের বিরাট প্রভাব ছিলো।

সেকালে কোনো বোর্ডের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতোনা। সারা দেশের আলিমরা এক জায়গায় বসে শিক্ষানীতি, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্য তালিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করতেননা। তবে সকলেই একই দীন ও আদর্শের অনুসারী হবার কারণে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার একটা বুনিয়াদী কাঠামো গড়ে ওঠে। পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য তালিকার ক্ষেত্রে একটা সমন্বিত রূপ পরিলক্ষিত হয়।

২৫. পাঠ্য তালিকা : মকতব

১. সর্ব প্রথম 'কায়দায়ে বাগদাদি' পড়ানো হতো।

২. অতপর কুরআন শরীফের ৩০ তম পারা [আমপারা] পড়ানো হতো।

৩. আমপারা শেষ হবার পর গোটা কুরআন মজীদ খতম করানো হতো। কুরআন মজীদ খতম করার আগে অন্য কোনো কিতাব পড়ানো হতোনা।

৪. কুরআন মজীদ খতমের পর 'কারিমা' প্রভৃতি চরিত্র গঠনমূলক ফার্সি বই পড়ানো হতো।

৫. অযু এবং নামায শিখানো হতো। সকল ছাত্রকেই [আসর] নামাযের জামায়াতে শরীক হতে হতো।

২৬. শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ মকতব

১. শিক্ষক ছাত্র সকলেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে পাঠ আরম্ভ করতেন।

২. ছাত্ররা বিছানায় উস্তাদের সম্মুখে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসতো।

৩. ছাত্রদের প্রথমে বিগত পাঠ শুনাতে হতো। তা শুনাতে পারলেই নতুন সবক [পাঠ] দেয়া হতো।

৪. বৃহস্পতিবারে নতুন করে সবক দেয়া হতোনা। সেদিন বিগত সাত দিনের পড়া শিক্ষক শুনতেন।

শিশুরা সাধারণত সাত/আট বছর বয়সেই কুরআন পড়ে শেষ করতো। পূর্ণ কুরআন খতম করার পূর্বে কোনো ছাত্রই অন্য কোনো শিক্ষা আরম্ভ করতে পারতোনা।

২৭. পাঠ্য বিষয় ঃ ফার্সি মাদ্রাসা

সুলতান মাহমুদ গযনভীর শাসনকাল থেকে নিয়ে কোম্পানীর শাসনকাল পর্যন্ত [১০৩০-১৮৩৫ খৃঃ] ফার্সি ছিলো এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। সে জন্যে এদেশে ব্যাপক হারে ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্ররাও পড়তো। ফার্সি ভাষা ছাড়াও জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাও দেয়া হতো। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বিষয় ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. ফিকহ্

২. আখলাক ঃ এতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও অন্তর্ভুক্ত হতো। যেমনঃ নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি।

৩. ইতিহাস ঃ ইতিহাসের সাথে কিস্‌সা কাহিনীও পড়ানো হতো।

৪. ভাষা ও সাহিত্য ঃ এতে ফার্সি গদ্য ও পদ্য পড়ানো হতো।

৫. পত্র ঃ এর দ্বারা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দস্তাবিজ ইত্যাদি লেখা শিখানো হতো।

৬. গণিত ঃ এতে ব্যবসা বাণিজ্য ও হিসাব শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞানদান করা হতো।

৭. খোশ নবিশি [সুলেখা]

ফার্সি মাদ্রাসায় শিক্ষার মেয়াদ কতো বছর ছিলো তা বিস্তারিতভাবে কিছু

জানা যায়না। নবাব মিরযা দাগের [১২৪৭-১৩২৫ হিঃ] একটা পত্র থেকে জানা যায়, তিনি তিন বছরে ফার্সি মাদ্রাসার পড়ালেখা শেষ করেন।

২৮. শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ ফার্সি মাদ্রাসা

১. কুরআন মজীদ খতম হবার পর পরই ফার্সি ভাষা শিক্ষাদান শুরু হতো।

২. মুখস্ত করার প্রতি জোর দেয়া হতো।

৩. ছাত্ররা শুনে এবং পড়ে পাঠ মুখস্ত করতো।

৪. প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথকভাবে পাঠদান করা হতো। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

৫. তৃতীয় পহর সুলেখা এবং অংকের জন্যে নির্দিষ্ট থাকতো।

৬. সাধারণত বুধবারে নতুন কিতাবের সবক দেয়া হতো।

২৯. পাঠ্য বিষয় ঃ আরবি মাদ্রাসা

মুসলিম শাসনামলে এদেশে আরবি মাদ্রাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরবি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো। আরবি মাদ্রাসাগুলোতে পাঠ্যগ্রন্থ নির্বাচনে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানদানের উপযুক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হতো। শেষ পর্যায়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হতো। পাঠ্য গ্রন্থাবলী পরিবর্তন করা হতো খুব কমই। মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন সময় আরবি মাদ্রাসাগুলোতে মোটামুটি নিম্নরূপ পাঠ্য বিষয় চালু ছিলো ঃ

১. ইলমে সরফ,

২. ইলমে নাহু,

৩. উসূলে ফিকহ,

৪. ফিকহ,

৫. তাফসীর,

৬. হাদীস,

৭. ইলমে কালাম,

৮. মানতিক, ফালসাফা [দর্শনশাস্ত্র],

৯. তাসাউফ,

১০. আরবি সাহিত্য [গদ্য ও পদ্য]।

৩০. শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আরবি মাদ্রাসা

পাঠ্য গ্রন্থাবলী গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে পড়ানো হতো।

১. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ঃ এ পর্যায়ে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বুঝাতেন। এ পদ্ধতি আধুনিক কালের Lecture Method-এর অনুরূপ।

২. মধ্যম পদ্ধতি ঃ এ পর্যায়ে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র প্রভৃতিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো। সন্দেহ সংশয়ের নিরসন করা হতো এবং সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো। এটা ছিলো সুক্ষ্ম INTENSIVE অধ্যয়ন পদ্ধতি।

৩. ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি ঃ এ পর্যায়ে উপরোক্ত দু'প্রকারের আলোচনা ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং উপমা উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা করা হতো। এটা ছিলো ব্যাপক (EXTENSIVE) অধ্যয়ন পদ্ধতি।

৩১. দারসে নিযামি মাদ্রাসা

মোল্লা কুতুবুদ্দীন নামে একজন বিখ্যাত আলিম মাদ্রাসাসমূহের তৎকালীন সিলেবাস সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটা নতুন সিলেবাস তৈরী করে যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন [মৃত্যু ১৭৪৭ খৃঃ] পিতার পদ্ধতিতে আরো অধিক চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেক বিষয়ে দু'দুটি কিতাব নির্বাচন করে নতুন সিলেবাস চালু করেন। তার নাম অনুযায়ী এ সিলেবাসের মাদ্রাসাগুলো দারসে নিযামি মাদ্রাসা নামে অভিহিত ছিলো।

৩২. নারী শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে নারী শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো। মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যা সন্তানদের পড়া লেখা করাতেন। মেয়েরা ব্যাপকহারে মকতবে কুরআন শিক্ষা করতো। দিল্লীর এক সময়ের একজন শাসক ছিলেন একজন নারী, সুলতানা রাজিয়া। তিনি ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতা [১৩০৩-১৩৭৭ খৃঃ] তার ঐতিহাসিক সফরে এদেশে তিনটি মহিলা মাদ্রাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীর মহলে দশ হাজার মহিলা ছিলো। মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে হাজার হাজার হাফেযা, কারিয়া, দীনের আলেমা ও শিক্ষিকা ছিলেন।

মুসলিম আমলে শিক্ষার দিক থেকে এ দেশে নারীদের খুবই খ্যাতি ছিলো।

৩৩. চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা

মুসলিম আমলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা ছিলো বলে জানা যায়না। তবে এসব বিদ্যায় বহু দক্ষ মুসলমানের নাম জানা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, হয়তোবা কোনো কোনো মাদ্রাসায় এসব বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো। এসব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম আমলের ব্যাপক স্থাপত্য নিদর্শন থেকে বুঝা যায় যে, তখন সুদক্ষ কারিগর তৈরি হতো।

৩৪. উপসংহার

মুসলিম শাসনামলে এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এতোক্ষণ আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, যে শিক্ষা ব্যবস্থা শত শত বছর ধরে এদেশে প্রচলিত ছিলো, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো আল্লাহ্‌র একত্ব এবং আখিরাতে তাঁর সম্মুখে জবাবদিহির সুদৃঢ় বিশ্বাসের ওপর। এ বিশ্বাসই মুসলমানদের মন মগজকে যাবতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগির সীমা পরিসীমা অতিক্রম করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ মানুষ তৈরির কারখানা। গোটা ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার জন্যে সর্ব প্রকার দক্ষ মানুষ এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তৈরি হতো। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন ঃ

> "আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীই ছিলোনা, বরং জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি ও মেধাগত দিক থেকেও তারা ছিলো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ...তাদের হাতে ছিলো এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখা যায়না। এতে ছিলো উন্নত নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের সু ব্যবস্থা।"

মাওলানা মওদূদী [র] মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এক পর্যালোচনায় বলেন ঃ

> "তখন আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো, তা সময়ের দাবি ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলো। এ ব্যবস্থায় এমন সকল বিষয়ই পড়ানো হতো, যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন ছিলো। তাতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতোনা বরং সে শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শন, মানতিক, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার প্রেক্ষিতে আমরা গোলামে পরিণত হলাম, তখন এ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।"

৭

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা চলে আসছে আরো আগে থেকে।

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে চালু ছিলো ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হতো আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম এবং দেশ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব ও জনশক্তি।

কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে নিতে থাকে, তখন থেকে তারা এ দেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের মানসিক গোলাম হিসেবে তৈরি হবে। তাদের খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবেনা। শেষ পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাহীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তার শৌর্যবীর্য হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা জমে উঠে। চাকুরি বাকরিসহ বস্তুগত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সেই থেকে এদেশে চালু হয় দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি হলো বৃটিশদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। আর অপরটি হলো পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলমানদের ধর্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে।

এ সময় মুসলমানরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার কারণেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় ভারত।

মুসলমানরা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনার জন্যে। তাদের আদর্শিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি চালু করবার জন্যে। কিন্তু যারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে, তারা মুসলমানদের এই প্রাণের দাবির সাথে গাদ্দারি করে। তারা পাকিস্তানে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও চালু করেনি। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেনি। তারা ইংরেজদের চালু করে যাওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা সবই হুবহু বহাল রাখে।কিছু সংস্কার সংশোধন করলেও ইসলামের পক্ষে তেমন কিছুই করেনি। কেবল মুসলমান জনগণের প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' নামের সাইন বোর্ডটি গ্রহণ করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা করেননি। অতপর চব্বিশ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেংগে যায়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যায় পাকিস্তান হিসেবে।

স্বাধীন বাংলাদেশেরও চব্বিশ বছর বিগত হলো। আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে চালু হয়নি। জনগণের প্রাণের দাবি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৯৭১-র স্বাধীনতার পর কয়েকবারই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা, মজীদ খান ও প্রফেসর মফিজ উদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম কমিশনটি ছিলো ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন। এ কমিশনের রিপোর্টের উপর বিগত ৪ ফেব্রুয়ারি '৯৭ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে একটি আলোচনা সভার স্বাগত ভাষণে আমি বলেছিলাম ঃ

"আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন সরকার কর্তৃক ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। একই সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশন সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতপর কমিশন সরকারি প্রস্তাবের নির্দেশনানুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট গ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ ভূমিকা)

আপনারা একথাও অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়টিও নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকার উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে গণমুখী ও যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছে।

একথাতে তো কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জন্যে অবশ্যি একটি যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রয়োজন। কিন্তু 'যুগোপযোগী' এবং 'বাস্তবভিত্তিক' কথা দুটি আপেক্ষিক। এ দুটি কথাই দৃষ্টিভংগি দ্বারা বিবেচিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকেও গণমুখী, যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা রিপোর্ট বলা হয়েছিল।

এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় ঃ 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে।'

নবদিগন্ত সূচনাকারী সেসব সুপারিশ কি? উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে আমি কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি ঃ

১. "কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা

সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১ ঃ ১)

২. "আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ২)

৩. "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকদের..... শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ৫)

৪. "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ৯)

৫. "প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।" (অধ্যায় ২ ঃ ১৩)

৬. সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।" (অধ্যায় ৭ ঃ ৯)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবেনা)।

৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় ঃ সাপ্তাহিক পিরিয়ড ঃ

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবেনা। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ধর্ম শিক্ষার ২টি করে পিরিয়ড থাকবে। (অধ্যায় ৭ঃ১০)

৮. "মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত।" (অধ্যায় ৭ ঃ ১০)। (অর্থাৎ সহশিক্ষা)।

৯. "নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে ঃ (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।" (অধ্যায় ৮ ঃ ৫)। (ধর্মীয় শিক্ষা থাকবেনা)।

১০. "মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১১ ঃ ২)

১১. "বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পূনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে।" (অধ্যায় ১১ ঃ ৩)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা থাকবেনা)।

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করার জন্যে অনেকগুলো প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতির ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার একটা পরিকল্পনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত বিশেষ ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে কতটা গণমুখী ও বাস্তব ভিত্তিক বলা যায়?

বর্তমান সরকার উক্ত কমিশনের সুপারিশমালাকে বাস্তবভিত্তিক করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটি কি কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালায় সন্নিবেশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগি পাল্টাবে? জাতির ঈমান আকীদা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা কি তারা চিন্তা করবে? তারা কি পারবে ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে? দীনি শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে?

সরকার কমিটি সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করার পর জাতি হতাশ হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ কমিটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কমিটি জাতির প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে সচেতন মহল মনে করতে পারছেনা। ফলে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।"[১]

সরকার ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে বাস্তবভিত্তিক ও যুগোপযোগী করার জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে (জানুয়ারি '৯৭-তে), সে কমিটিকে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা প্রদানের জন্যে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ ২১

১. দ্রষ্টব্য ঃ 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা'-গ্রন্থ, প্রকাশক ঃ সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, জুন ১৯৯৭।

মার্চ '৯৭ তারিখে NAEM-এ এক সেমিনার কাম ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে স্বাগত ভাষণ প্রদানকালে আমি বলেছিলাম ঃ

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু নীতিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে বিভ্রান্ত করে। শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে স্রষ্টামুখী করে এবং সাথে সাথে জীবন ও জগতকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষানীতি আমাদের লাগবেই। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন্ দৃষ্টিভংগি, ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস, কোন ঐতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই? একথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভংগি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stanly Hull-এর কথাই যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, তিনটি 'R' অর্থাৎ Reading, Writing এবং Arithmetic এর সাথে যদি ৪র্থ 'R' অর্থাৎ Religion যুক্ত না হয়, তাহলে আপনি কেবল ৫ম, 'R' মানে Rascal-ই পাবেন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা Rascal হতে বাধ্য। বিশ্বের সব ধর্মের লোকই এক স্রষ্টাকে জানে এবং মানে। তাই শিক্ষা অবশ্যি এক আল্লাহ্মুখী হতে হবে। তিনি এবং তাঁর বিধানই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে পারে। মানুষের সত্তাকে তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসেন। 'আমি এমন প্রেমিক চাই, যে আমার সোনালি চুলকে নয়, আমার সত্তাকে ভালোবাসবে' প্রেমিকার এ দাবির প্রেক্ষিতে মহাকবি W. B. Yeats বলেছিলেন ঃ

"I heard an old religious man
But yesternight declare
That he had found & text to prove
That only God, my dear,
Could love you for your self alone
And not for your yellow hair."

হ্যাঁ, কেবল আল্লাহ্ই মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসেন। তাই কেবল তাঁর বিধানই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের গ্যারান্টি। মানব কল্যাণের শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে।

অপরদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে এতোটা উন্নত যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী, যেনো এ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা জীবন ও জগতকে জানতে শিখে, জীবন ও জগতের প্রতিটি বিভাগকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করতে শিখে এবং জীবন ও জগতকে দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী খাতে পরিচালনা করতে শিখে।

আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতির মৌলিক কথা কি এটাই নয়? সরকার গঠিত বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কি এই মৌলিক কথাটির প্রতি লক্ষ্য করবেন? তাঁরা কি আমাদের জাতি, জাতিসত্তা, জাতির আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস ঐতিহ্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করবেন? অতীতের কমশিনগুলোর মতো এ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা ভুল করবেন নাতো? এ ক্ষেত্রে তাঁরা জাতির বৃহত্তর জনগণের চিন্তা চেতনার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন নাতো?

আমরা চাই, তাঁরা সে ভুল না করুন। তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। জাতির জন্যে কল্যাণকর সুপারিশমালা তৈরি করুন। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টে যা কিছু জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে, সেগুলো তাঁরা রহিত করুন। জাতির আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে এ রিপোর্টে যা কিছু কমতি আছে সেগুলো তাঁরা সংযোজিত করুন। আমাদের জীবন ও জগতকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তাতে যেসব প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ সেগুলো রহিত করুন। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী আরো যা কিছু সংযোজন করা দরকার, সেগুলো সংযোজন করুন। তাছাড়া এ রিপোর্টে ভালো ও কল্যাণকর যা কিছু আছে সেগুলো বহাল রাখুন।"২

এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গেলো। ১৯৮৮ সালে প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়। এটি কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের চেয়ে কিছুটা উন্নতর। এ রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

অধ্যায় ১

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.১ বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ

২. দ্রষ্টব্য ঃ 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা'-গ্রন্থ, প্রকাশক ঃ সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, জুন ১৯৯৭।

থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সচেতনতা।

১.২ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজবীন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১.৩ জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যেগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১.৪ আমাদের দেশে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেজন্য তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যবস্থা অবশ্যই এমন হতে হবে যেন সকলেই তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করবে এবং সংগে সংগে একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগ প্রদান করবে।

১.৫ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানুষের মর্যাদা ইত্যাদি কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গণতন্ত্রে সমাজের সকলের

সমান অধিকার ও কর্তব্য সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে যথাযথ ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

১.৬ সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজ প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ আশা-আকাঙখা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। এর লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধের সঞ্চার করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী করা এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল করে তোলা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙখার সংগে একাত্ম হয়ে উঠবে। আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে যাতে এগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটে সে দিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টি রাখতে হবে।

১.৭ যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য অবহিত করা, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙখার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাংগীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে।

১.৮ নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

১.৯ কোনো রকম কূপমন্ডুকতা যাতে দেশবাসীর চিত্তে সংকীর্ণতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবণতার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। আধুনিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রমেই পরস্পরের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে এবং মানুষের চিন্তাভাবনা ও তৎপরতা দেশ ও রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে। উদার বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করার দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা সচেতন লক্ষ্য রাখবে।

১.১০ নানা রকম কুসংস্কার এবং অন্ধ ও অযৌক্তিক ধারণা মোচন করে দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক, বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভংগি গড়ে তোলা দরকার। নানারকম দুর্নীতি অবসানের লক্ষ্যে আদর্শবাদী, নীতিবান ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজন। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ন্যূনতম শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১.১১ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অর্পিত। বর্তমানে আমাদের বিপুল জনশক্তি জাতীয় সম্পদের উৎস না হয়ে আমাদের অর্থনীতির উপর একটি বিরাট বোঝাস্বরূপ চেপে রয়েছে। শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে শক্তিশালী কর্মপন্থা গ্রহণ করলে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারব।

১.১২ অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক বিনিয়োগ বলে জনসাধারণের শিক্ষা লাভের সংগে সংগে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সূচিত হয়। প্রধানত একটি দেশের সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন দ্বারাই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব। সে অগ্রগতি দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে জাতীয় সম্পদ নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ হবে। জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

১.১৩. কায়িক শ্রমের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আমাদের দেশে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই প্রবণতা থেকে রেহাই না পেলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়ন মন্থর গতিতে চলবে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেসব বয়স্ক কর্মজীবী ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাদের শিক্ষাদানের সাহায্যে শ্রম দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী উন্নয়নের সুযোগ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। দারিদ্রের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা দরকার। সংক্ষেপে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন একদিকে সমগ্র ব্যবস্থার প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সংগে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে, তেমনি কলা, বিজ্ঞান বাণিজ্য কৃষি প্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে।

১.১৪ তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতার দ্রুত অবসান দরকার। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়, উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণ বিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার।"৩

এ রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় ঃ

"৫। মাদ্রাসা শিক্ষা

১. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক। মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

২. **ইবতেদায়ী ঃ** মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে পাঁচ বছর ব্যাপী ইবতেদায়ী। সাম্প্রতিককালে অপরিকল্পিতভাবে এ জাতীয় মাদ্রাসার দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এ সকল মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং আর্থিক সংকট বিদ্যমান।

৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮ ঃ অধ্যায়-১।

সুপারিশ

১. ইবতেদায়ী মাদ্রাসার মেয়াদকাল, শিশুদের ভর্তির বয়স, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ হবে। তবে আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত (আলিম) হবেন।

২. ইবতেদায়ি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য পি,টি,আই সমূহে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৩. ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে। প্রতিটি মাদ্রাসার বৈষয়িক সুবিধাবলী নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকসমূহের সংগে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ অবশ্য পাঠ্য করতে হবে।

৬. পর্যায়ক্রমে এ মাদ্রাসাগুলোর জাতীয়করণ প্রয়োজন।

৩. **দাখিল ও আলিম ঃ** মাদ্রাসা শিক্ষার পরবর্তী দুটি স্তর হচ্ছে দাখিল ও আলিম। আর্থিক অনটন এ জাতীয় মাদ্রাসাগুলোর অন্যতম সমস্যা। এ সকল মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

সুপারিশ

১. দাখিল ও আলিম শিক্ষাস্তর যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বছর মেয়াদী থাকবে। দুটি স্তরের শেষে প্রান্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, দাখিল স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন এবং আলিম স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ-এ সব শাখা প্রবর্তিত হবে।

২. শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অন্যত্র প্রদত্ত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত

সুপারিশমালার সংগে সংগতি রক্ষা করে দাখিল ও আলিম প্রান্তিক পরীক্ষার সংস্কার করতে হবে।

৩. এ জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডকে ভূমির পরিমাণ, পারস্পরিক দূরত্ব, ছাত্র সংখ্যা, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, যোগ্য শিক্ষক ইত্যাদি ব্যাপারে অবশ্যপালনীয় শর্ত আরোপ করতে হবে।

৪. এ দুটি স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আরবী ব্যবহৃত হবে।

৫. এ স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং কারিগরি ও উৎপাদমুখী কাজে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কর্মমুখী শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৬. দাখিল ও আলিম মাদ্রাসাসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ এবং নিয়েয়ার ও আই, ই, আর যথাক্রমে শিক্ষকদের কর্মপূর্ব কর্মকালীন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক-শিক্ষণ অনু অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৪. ফাযিল ও কামিল ঃ ফাযিল পাস ও অনার্স কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছর এবং পাস ও অনার্স ডিগ্রীপ্রাপ্তদের জন্য কামিল কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে ২ ও ১ বছর।

সুপারিশ

১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে এবং যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত হবে।

২. ফাযিল মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্গঠন করে সামাজিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সংগে সমন্বিত করতে হবে।"৪

এযাবত যতোগুলো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টই প্রকাশ হয়েছে, তার কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচিকে বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক দৃষ্টিভংগির সমন্বয়ে এখনো ঢেলে সাজানো হয়নি।

আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশনাল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। একই জাতির লোকেরা দুই ধারায় শিক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ধারার দিগদর্শন দুই বলয়ে অবস্থিত। এক ধারার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করেনা। আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে এর কোনো ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয়। উভয় ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে গেছে সেটাকেই আমরা বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিরেট কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। তাই এটাকে 'বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা' বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভু ভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে।

বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষণ করতে। তাই এদেশীয়দের মধ্য থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভু মনে করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায়

৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮।

দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে। যে ব্যক্তি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যতো বেশি নিষ্ঠার সাথে সেবা করবে সে নিজেকে ততোবেশি গৌরবান্বিত মনে করবে।

তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিলো রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তা থেকে তৈরি হচ্ছিলো সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করছিল প্রভু ভক্ত ও আনুগত্য পরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেণীর লোক তৈরি করছিল। তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখনো চালু আছে। এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ও আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা বিচিত্রগামী। এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছে।

এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও জীবন বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভংগি অনুপুস্থিত।

২. ঈমানি দর্শন বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে সঠিক জীবন দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্, আল্লাহর একত্ব, রিসালাত, আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত, জাহান্নাম

ইত্যাদি ঈমানি দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরকাল বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষকে তার শাশ্বত জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও সার্থকতা জানবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

৩. জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ্ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসেনা। মহান আল্লাহ্ অহী ও নবূয়্যতের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪. প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোনো মহত লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনা।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা : এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদন্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফল এ রকমই হয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেনা, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করেনা, আদর্শ জীবন পদ্ধতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনা, সে শিক্ষা ব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদন্ডহীন। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে

নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কুফলে আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধঃপতনের দিকে তলিয়েই চলেছে।

৬. নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা ঃ আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্যে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায়না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হবার আশা করা যায়না। তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি [National Consensus] সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহুমত ও পথের অধিকারী বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে গড়ে উঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং জাতিকেও বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে। ফলে জাতির মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। ঐক্য ও সংহতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

৮. সংকীর্ণ মতপার্থক্য [Fanatic dissentions] সৃষ্টি ও লালন করা এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট।

৯. সন্ত্রাস ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

১১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির লোক তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যাণকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার চরম

কুফল জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

১২. দুর্নীতির প্রসার ঃ দুর্নীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে জঘণ্য ঘুষখোর, চোরাকারবারী, মানুষের অধিকার হরণকারী, আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, স্বজনপ্রীতিকারী, যুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রতারক, চোর ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য,আদর্শ মানুষ তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাজে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে।

১৩. ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় ঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ধর্মহীন ভাবধারার সাথে 'ইসলামিয়াত' ও 'ইসলামের ইতিহাসের' লেজুড় জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখনো ঐচ্ছিক, কখনো বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

'ইসলামের ইতিহাস' নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা পাশ করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা মুসলিম যুবকদের ইসলাম বিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে ইসলামকে একটি জঘণ্য মানবতা বিরোধী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' নীতি গ্রহণ করে।

'ইসলামিয়াত' বা 'ইসলামী শিক্ষা' নামে যে বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে ইসলামের পূর্ণাংগ ধারণা দেয়া হয়না। তবে যতটুকু ধারণাই দেয়া হয় তার ফলাফল ইসলামের পক্ষে খুব একটা যায়না। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

পয়লা কারণ হলো, নিচের শ্রেণীগুলোর ইসলামিয়াত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়না।

ইসলামিয়াত বিষয়টি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরগাছার মতো। ছাত্রদের অন্য সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ্ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে। আল্লাহ্ রসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করেনা। ছাত্রদের গোটা চিন্তাধারাই এ দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলা হয়। অতপর ইসলামিয়াতের ক্লাসে মৌলভি সাহেব আল্লাহ্, রসূল, কিতাব ও পরকাল আছে এবং এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে বলে শিক্ষা দেন।

একদিকে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ্ বিমুখ দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি করা হচ্ছে, অপরদিকে ইসলামিয়াত ক্লাসে আল্লাহ্মুখী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগির সাথে ইসলামিয়াতের এই শিক্ষা খাপ খায়না। ফলে ছাত্রদের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে ইসলামিয়াতের শিক্ষাটা পরগাছার মতোই থেকে যাচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টিভংগির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে। নিরানব্বই মণ লবণের সাথে এক মণ চিনি মিশালে সে চিনি লবণের সাথে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এভাবেই প্রবল আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভংগি গড়ে তুলে তার উপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং সে দ্বন্দ্বে বেচারা পরগাছা ইসলামিয়াত চরমভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে ইসলামের বিরোধিতায় তারা সাহসী হয়ে উঠে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কথায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চাইতে ঘৃণীত বিভাগ সম্ভবত এটি। এ বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা 'মোল্লা' 'মৌলবাদী' খেতাবে ভূষিত। এ বিভাগের ছাত্রদের কর্মপোযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে পাশ করার পর তাদের না সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় আর না সিভিল প্রশাসনে। কোনো প্রকারে ইসলামিয়াতের শিক্ষকতা করে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাদের সামাজিক মর্যাদাকে হেয় করে দেখা হয়। মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার এই লেজুড় ও পরগাছা থেকে ছাত্ররা ঃ

ক. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানতে পারেনা।

খ. ইসলামকে হানাহানি কাটাকাটির ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে শিক্ষা লাভ করে।

গ. তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

ঘ. ইসলামকে একটি খেল তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।

ঙ. এটাকে সমাজের জন্যে কল্যাণকর মনে করা হয়না।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দু'টি ধারা চালু আছে। একটি হলো 'দরসে নেজামি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা। অপরটি হলো আলীয়া পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সূচনা হয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ পদ্ধতি শ্রেণী ভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড় লাগানো হয়েছে। এই দুই ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব কমই। মূলত উভয় ধারাই মুসলিম শাসন আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তারই শিক্ষাক্রমের অনুসারী।

মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো যুগ উপযোগী। তখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রাষ্ট্র নায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কুটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর দায়িত্বশীল লোক।

এরপর বৃটিশরা এলো। তারা তাদের ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব নিয়ে চলতে থাকে। বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। অতপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীনত্ব নিয়েই সে এখনো ভবিষ্যত্বের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম সম্রাজ্যের পতন হয়। দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণ করে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে পড়ে আছে আপন স্থানে।

ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো ততোই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলী ও জীবনধারার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তাদের জন্যে মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকতা, ইসকুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকরণ আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান ছুটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত ঃ

১. মূল শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের কার্যকারিতা বর্জিত।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়।

৩. এখানে যুগ উপযোগী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাশ করার পর পুণরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়না।

৪. এখানে প্রাচীন ফিক্হ শাস্ত্রের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তাও পূর্ণাংগ কুরআন পড়ানো হয়না। কুরআনের উপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই।

৬. হাদীস শাস্ত্রেরও একই অবস্থা। হাদীসের উপর গবেষণাধর্মী পড়া লেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

৭. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায়না।

৮. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্যে লোক তৈরি হয়না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। কুটনীতিক তৈরি

হয়না। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয়না। রাষ্ট্র নায়ক তৈরি হয়না। ফলে এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার 'কী পোস্ট'গুলোতে তাদের স্থান হয়না।

৯. এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছেনা। ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা লাভ করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদমর্যাদায় তারা অধিষ্ঠিত হতে পারছেনা। ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় হয়ে থাকতে হয়।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে দক্ষ জনশক্তি লাভ করা যায়না. সে কারণে মাদ্রাসাগুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত।

১১. মাদ্রাসাগুলোতে যারা শিক্ষা দান করেন, তারাও অদক্ষ। তাদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো উপযোগিতা নেই।

১২. মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও কর্মহীনতার কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সারাদেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তার করে আছে।

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা সমাজ পরিচালনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন করেনা, সেজন্যে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রসায় ভর্তি করাননা। কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে ঃ

ক. একান্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার কামনায়।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার নিয়্যতে।

গ. গরীব লোকরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়।

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টিকে থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে বহু মাদ্রাসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চাইতে বাড়িয়ে দেখাতে হচ্ছে।

এ থেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিকভাবে অনাস্থা কতো প্রবল এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা কতোটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে।

মেরামত করে কাজ হবেনা

আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এইসব দূর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রসাগুলোতে উর্দূ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ আমলে আলীয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়েছে। দরসে নিযামি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি। বিভিন্ন সময় আলীয়া পদ্ধতি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এগুলো খুব একটা খাপ খায়নি। ফলে এসব মেরামত/সংস্কার দ্বারা মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন সময় সংস্কার মেরামত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভাবধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের

আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা ফল হবেনা। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতির কল্যাণ ও আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্ব নিজেদের উপর। নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা পঁচাশিভাগ নাগরিক মুসলমান। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয়, আল্লাহ্ভক্ত ও ধর্মভীরু।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পিছে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে গৌরবান্বিত ইতিহাস। আছে মহান ঐতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা। আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। আমাদের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কাছে নির্ভুল জীবন বিধান নেই।

সারা বিশ্বে আমাদের সোয়াশো কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা আমাদের অংশ। তারা আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী।

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রণয়ন করতে হবে নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে নদীর স্রোতধারার মতো।

এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের একটি আদর্শ ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করবে। আমাদের জাতিকে প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করাবে। স্বাধীন মর্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে শিখাবে। আমাদেরকে পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্যতা দান করবে।

৮

ইসলামী শিক্ষানীতি ঃ একটি মৌলিক প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ। এখানকার ৮৭% জন নাগরিক মুসলিম। এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ইসলাম প্রিয়। এখানকার মুসলমানরা আল্লাহ্, আল্লাহর রসূল এবং ইসলামের নিদর্শনাবলীর জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি। ইসলামী শিক্ষানীতি চালু করার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমস্যাও নেই। কারণ ঃ

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম।

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১ক) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছেঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।'

৩. এদেশের ৮৭% জন নাগরিক মুসলমান।

৪. এদেশের মুসলমানরা কাজেও ইসলামের ভক্ত অনুরক্ত এবং ইসলামের জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত।

৫. এদেশের মানুষ ইসলামের অবমাননা বরদাশত করেনা।

৬. এদেশের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার ও সরকার প্রধান সকলেই মুসলমান।

৭. প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাই মুসলমান।

৮. মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে ধর্মের বিকল্প নেই, একথা আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অনেক রাষ্ট্র নায়ক

কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে। আর ধর্মের মধ্যে ইসলামই যে সর্বাধিক উদার, বাস্তব, পূর্ণাংগ ও প্রগতিশীল একথাও স্বীকৃত হয়েছে।

৯. তাছাড়া যেহেতু, মূলতই ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে রয়েছে এবং এটি একটি উদার ও সার্বজনীন ব্যবস্থা।

১০. এটি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা এবং

১১. ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে যোগ্য ও দক্ষ প্রচুর বিশেষজ্ঞ এখানে বর্তমান রয়েছে।

-সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অবশ্যি ইসলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি।

ক. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে, সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করে এসেছি। তার আলোকেই আমরা এখানে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টসমূহ হবে নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা)কে সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আব্দ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।

১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।

১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা (Creativity) বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

১৫. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।

১৬. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।

১৭. নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।

১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

১৯. ইন্দ্রিয় শক্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন ঃ ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে। এগুলোই মানুষের সকল কাজের পরিচালক। আসলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও মানুষকে সাহায্য করে তার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ। তার ঃ

১. মন,

২. মস্তিষ্ক,

৩. দৃষ্টি শক্তি,
৪. শ্রবণ শক্তি,
৫. ঘ্রাণ শক্তি,
৬. স্পর্শানুভূতি,
৭. বাক শক্তি।

এগুলোর সাহায্যে মানুষ-

১. অনুভব করে,
২. চিন্তা করে,
৩. বিবেচনা করে,
৪. অনুধাবন করে,
৫. অনুসন্ধান করে,
৬. মর্ম উপলব্ধি করে,
৭. উদ্ভাবন করে,
৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,
৯. প্রকাশ করে,
১০. ধারণ বা সংরক্ষণ করে।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের এসব সুপ্ত শক্তি বিকশিত, প্রস্ফুটিত ও সংহত করে দিতে চায়।

খ. ইসলামী শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট

এখানে আমরা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। এ রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মৌলিক নির্দেশনামূলক। ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব লাভ করবেন, এটি তাদের খানিকটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা করি।

১. জ্ঞানের মূল উৎস 'ওহী' র জ্ঞান ঃ ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম। বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বাহক বই। 'বই' শব্দটিও এসেছে 'ওহী' থেকে। মূলত 'বই' ওহী'র রূপান্তর। এভাবে ঃ ওহী > বহি > বই।

এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস। ওহী হলো, মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক সর্বাংগীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে নবী রসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বা হিদায়াত।

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল

সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষাও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমকে এ মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল ভিত্তির উপর। রসূলের (সা) সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তিনিও সে ব্যাখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়। সুতরাং রসূলের (সা) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। আর এটাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

আল কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা হুদাল্লিন্নাস 'মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথনির্দেশ' বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের জ্ঞানার্জনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর হাদীস ও সুন্নাতে রসূল যেহেতু কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহ্কেও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ঃ 'মাতৃভাষা' তথা 'জাতীয় ভাষা' শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে 'জাতীয় ভাষায়'। নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন ঃ

> "আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪)

৩. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরিব ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখাতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করতে হবে।

৫. উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইস-লামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. দীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৭. শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

৯. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী।

১০. শিক্ষকতার পেশা হবে সবচে' সম্মানীয়। শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য।

১১. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক।

১২. পাঠক্রম ও পাঠসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভংগি (World outlook) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তরভুক্ত করতে হবে।

১৩. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

১৪. পাঠ্যসূচিত ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তরভুক্ত হবে।

১৬. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।

১৭. অবাধ সহশিক্ষা থাকবেনা।

১৮. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।

১৯. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল (Dynamic)। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অন্তর্গত (in built) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূর্ণবিন্যাস অনায়াসেই করা সম্ভব হয়।

২০. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের চেতনাকে।

২১. শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

২২. শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন।

২৩. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যি চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।

২৪. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।

২৫. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।

৯

পারিবারিক শিক্ষা

শিক্ষার সুবিস্তৃত সংজ্ঞা ও ধারণা আমাদের সামনে রয়েছে। মানব জীবনে সাধারণভাবে অসংখ্য রকম শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সেসব শিক্ষা ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে জীবন যাপন করতে পারেনা। সুন্দর জীবন প্রণালি গড়ে তুলতে পারেনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাস্তবে সব রকম শিক্ষা লাভ করা যায়না। মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের জন্যে যতো শিক্ষার প্রয়োজন, মানুষ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সেসব শিক্ষা গ্রহণ করে। এসব শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ত্রুটি বা কমতি থাকলে মানুষের জীবন যাপন প্রণালিতেও ত্রুটি থেকে যায়।

মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বহুবিধ। মানুষ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নানা রকম মাধ্যম থেকে সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা লাভের প্রধান প্রধান মাধ্যমগুলো হলো ঃ

১. পরিবার;

২. পরিবেশ;

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি];

৪. সমাজ;

৫. গ্রন্থ [পাঠ্য পুস্তকের বাইরের গ্রন্থ জগত];

৬. রাষ্ট্র/সরকার;
৭. তথ্য মাধ্যম;
৮. অন্যান্য।

এসবগুলোর মধ্যে পরিবারই হলো শিক্ষার সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম। জন্মের পর একটা সময় পর্যন্ত শিশুর অবস্থান পরিবারের পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলোতে শিশুরা বাবা মা, ভাই বোন, দাদা দাদি, চাচা চাচিদের মাঝেই বেড়ে উঠে। তাদের থেকে ভাষা শিখে। তাদের মুখের ভাষায় শিশুরা কথা বলে। শিশুরা এঁদের কথাবার্তার অনুকরণ করে। এঁদের চালচলনের অনুকরণ করে। এঁদের আচার আচরণের শিশুরা অনুবর্তন করে। শিশুরা তাদের দেখে গড়ে উঠে। তারা শিশুদের কাছে জীবন্ত মডেল। তাদের অভ্যাস ও চরিত্রের প্রভাব শিশুদের মধ্যে সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে।

শিশুরা পরিবার থেকেই জীবনের সর্ববিধ আচরণের শিক্ষা লাভ করে। এসব নিকটাত্মীয়দের যাবতীয় গুণাবলীতে তারা গুণান্বিত হয়। জীবনের এই সূচনালগ্নে তাদের মনমগজে যা কিছুরই চিত্রাংকিত হয়, তা তাদের জীবন থেকে মুছে যায়না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার পরও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার মধ্যে থেকে যায়। এমনকি কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পরও এ প্রভাব থেকে সে মুক্ত হয়না। তাই পরিবারই হলো মানব শিশুর জীবনে সবচাইতে প্রভাবশালী শিক্ষা কেন্দ্র। পরিবারের সদস্যরাই শিশুদের প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষক। সুতরাং পারিবারিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে শিশুরা। এখানকার ভালো মন্দই তাদের জীবনের আসল শিক্ষা হিসেবে থেকে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا- (التحريم : ٦)

"তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত তাহরীম ঃ ৬]

আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যে অর্থাৎ পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা ছাড়া জাহান্নাম-থেকে বাঁচার পথ তারা জানবে কিভাবে?

কুরআনে মজীদে অতীব প্রয়োজনীয় একটি দোয়া শিক্ষা দান করা হয়েছে। দোয়াটি হলো ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ– (الفرقان : ٧٤)

"আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও।" [সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪]

মুমিনের স্ত্রী এবং সন্তানরা তো কেবল তখনই তার চোখ জুড়াতে পারে, যখন তারা সত্যিকার মুমিন মুসলিম হবে। যখন তারা আল্লাহ্‌র অনুগত দাস হবে। যখন তারা আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হয়ে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে। আর তাদের এমনটি করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার। তাদের দিয়ে চোখ জুড়াতে হলে তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েই নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক শিক্ষা ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এভাবে গড়ে তোলা বড় কঠিন।

ক. কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক শিক্ষা

কুরআন মজীদে ইসলামী পরিবারের গুণবৈশিষ্ট সম্পর্কে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা বিশেষভাবে সেই আয়াতগুলো উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যেগুলোতে সন্তানদের ব্যাপারে বাবা মার কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. ঈমানের শিক্ষা ঃ পিতামাতার পয়লা কর্তব্য হলো সন্তানদের মুমিন বানানো। আল্লাহ্‌র পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরা। আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এমনি করে রিসালাত, আখিরাতসহ ঈমানিয়াতের পরিপূর্ণ ধারণা বিশ্বাস তাদের মনমগজে বসিয়ে দেয়া। নিজেদের বাস্তব জীবনকে ঈমানি আদর্শে পরিচালিত করা এবং নিজেদের এই ঈমানি চরিত্রের প্রভাবে সন্তানদের জীবন যাপন পদ্ধতি গড়ে তোলা। তাদের সত্যিকার মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাব প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার বাবা মা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়।"

মূলত স্বভাবগতভাবে শিশুরা ইসলামী স্বভাবের উপরই জন্ম নেয়। কিন্তু বাবা মা বা পরিবারের সদস্যরা যদি ইসলাম থেকে বিচ্যুত থাকে, অনৈসলামী ধ্যান ধারণা

ও চাল চলনের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে শিশু সন্তানরাও তাদের সেই ধ্যান ধারণা ও চাল চলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে বাবা মা এবং পরিবারের সদস্যরা যদি ঈমানের অনুসারী হয়, আল্লাহ্র পথের পথিক হয়, তাহলে তাদের সন্তানরা তাদের থেকে ঈমান এবং ইসলামের শিক্ষাই লাভ করবে। সন্তানরা ঈমানের পথেই তাদের অনুসরণ করবে। এমন বাবা মাকেই আল কুরআন সুসংবাদ দিচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ– (الطور : ٢١)

"যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরাও ঈমানের সাথে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সেসব সন্তানকে [জান্নাতে] তাদের সাথে একত্র করে দেবো আর তাদের আমলের কোনো কমতি আমি করবোনা।" [সূরা আততূর ঃ ২১]

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, সন্তানদের ঈমানের শিক্ষা দেয়া, ঈমানের পথে চলবার শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথে নিজেদের অনুসারী বানাবার মর্যাদা এতো বেশি যে, এর ফলে বাবা মা সন্তানদের নিয়ে বেহেশতেও পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবেন।

২. শির্ক থেকে সতর্ক করা ঃ তাওহীদ তথা এক আল্লাহ্র সাবভৌমত্বের বিপরীত বিশ্বাস হলো শিরক। যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্র সাথে কারো সমকক্ষতা, অংশীদারিত্ব, প্রতিপক্ষতা ও বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করাটাই শিরক। এই শির্ক যারা করে তারা মুশরিক। মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা মহাপাপ। শিরকের পাপ আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেননা। শিরক মহান আল্লাহ্র প্রতি এক বিরাট যুল্ম ও অবিচার। সন্তানদের শৈশব কাল থেকে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করা এবং শিরক সম্পর্কে সতর্ক করা বাবা মার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে প্রাচীন বিজ্ঞানী লুকমানের উদাহরণ তুলে ধরেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ– (لقمان : ١٣)

"লুকমানের কথা স্মরণ করো। সে তার পুত্রকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল

ঃ আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করোনা। অবশ্য অবশ্যি শির্‌ক এক বিরাট যুল্‌ম-অবিচার।" [সূরা লুকমান ঃ ১৩]

৩. আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির চেতনা জাগ্রত করা ঃ প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, সন্তানদের মন মস্তিষ্কে এ বিষয়ের তীব্র চেতনা বদ্ধমূল করে দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে অতিসূক্ষ্ম, অতি সংগোপনে এবং অতিদূরে কিংবা কাছে কোনো অপরাধ করলেও তা অবশ্যি আল্লাহ্ দেখেন, রেকর্ড করে রাখেন এবং সেটার হিসাব অবশ্যি আল্লাহ্‌র কাছে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুত্রের প্রতি বিজ্ঞানী লুকমানের উপদেশ তুলে ধরা হয়েছেঃ

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ- إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ- (لقمان : ١٦)

"[লুকমান ছেলেকে বলেছিল] পুত্র আমার! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণ ছোটও হয় আর তা যদি লুকিয়ে থাকে পাথরের ভেতরে, কিংবা আকাশে অথবা পৃথিবীর কোথাও, তবু তা আল্লাহ্ উদঘাটন করে আনবেন। তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞাত।" [সূরা লুকমান ঃ ১৬]

৪. সালাত কায়েমের শিক্ষা দান।

৫. মানুষকে ভালো কাজ করতে বলার শিক্ষাদান।

৬. মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার শিক্ষা দান।

৭. ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা দান করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে যে বাধা বিপত্তি আসবে সেই শিক্ষা দান এবং এসব বাধা বিপত্তি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার শিক্ষা দান।

এসব ক্ষেত্রে লুকমানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। লুকমান তার পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ- إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

"আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করো এবং [এ সব কাজ করতে গিয়ে] যতো বিপদই আসুক

না কেন, তাতে ধৈর্য দৃঢ়তা অবলম্বন করো। এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" [সূরা লুকমান ঃ ১৭]

৮. মানুষকে তুচ্ছ মনে না করার শিক্ষা দান।

৯. উদ্ধত চলাফেরা না করার শিক্ষা দান।

১০. চাল চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দান।

১১. সুন্দরভাবে কথা বলার শিক্ষা দান।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ- اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

"আর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের সাথে কথা বলোনা। পৃথিবীতে উদ্ধত চলাফেরা করোনা, কারণ আল্লাহ্ আত্মম্ভরি অহংকারীদের পছন্দ করেননা। নিজের চাল চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করো। কারণ সবচেয়ে খারাপ হলো গাধার আওয়াজ।" [সূরা লুকমান ঃ ১৮-১৯]

১২. পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা ঃ আল্লাহ্র অধিকারের পরেই পিতামাতার অধিকার। এ অধিকার সম্পর্কে কুরআন হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা বনি ইসরাঈলের দুটি আয়াত দেখুন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا- اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا-

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা। পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের দুজনই অথবা কোনো একজন যদি বৃদ্ধাবস্থায় তোমার কাছে থাকে, তবে তুমি তাদের 'উহ্' পর্যন্ত বলোনা। তাদের ভর্ৎসনা দিওনা। তাদের সাথে বিশেষ সম্মানের সাথে কথা বলো। তাদের সামনে নম্র ও বিনয়াবনত থাকো। আর তাঁদের

জন্যে এভাবে দোয়া করো ঃ আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি রহম করো, যেমনি করে তারা বাল্যকালে আমাকে পরম স্নেহ ও মমত্ববোধের সাথে প্রতিপালন করেছেন।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪]

এ প্রসংগে কুরআনের আরো অনেক আয়াত এবং অনেক হাদীস রয়েছে। তবে সেগুলো সবই উপরোক্ত আয়াত দুটির সমার্থক। এ আয়াতে নির্দেশিত শিক্ষা অনুযায়ী পিতামাতার ব্যাপারে সন্তানদের দৃষ্টি ভংগি গড়ে তুলতে হবে। এখানে নির্দেশিত শিক্ষাগুলোকে আমরা নিম্নক্রমে সাজাতে পারি ঃ

ক. গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পিতামাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

খ. তাঁদের সাথে সুন্দর চমৎকার আচরণ করতে হবে।

গ. তাঁদের সেবা যত্ন করতে হবে।

ঘ. বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে।

ঙ. তাঁদের কোনো কথা বা কাজে বিরক্ত হওয়া যাবেনা।

চ. তাঁদের মনে কষ্ট দেয়া যাবেনা।

ছ. তাঁদের সাথে সসম্মানে কথা বলতে হবে।

জ. তাঁদের প্রতি সব সময় নম্র ও বিনয়ী থাকতে হবে।

ঝ. বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের সেবা ঠিক সেভাবে করার চেষ্টা করতে হবে, শিশু বেলায় যেভাবে তাঁরা সন্তানদের সেবা করেন।

ঞ. আল্লাহ্র রহমত চেয়ে তাঁদের জন্যে দোয়া করতে হবে।

পিতামাতার প্রতি এরূপ সুন্দর আচরণের শিক্ষা স্বয়ং পিতামাতাই তাদের প্রদান করবেন। এ শিক্ষা দেবেন তারা দু'ভাবে। মৌখিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে এবং নিজেরা নিজেদের পিতামাতার সাথে অনুরূপ সুন্দর আচরণ করার মাধ্যমে। এই শেষোক্তটিই তাঁদের জন্যে হবে আসল শিক্ষা, কারণ শিশুরা শুনার চাইতে দেখেই অধিক শিক্ষা লাভ করে। মূলত পারিবারিক ঐতিহ্যগত শিক্ষার চাইতে বড় কোনো শিক্ষা নেই।

১৩. আদব কায়দা শিক্ষাদান ঃ সন্তানদের সুন্দর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান করা পিতামাতার কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ

"কোনো বাবা মা সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা দেয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করতে পারেনা।" [তিরমিযি]

এ হাদীসে সন্তানদের আদব শিক্ষা দেয়াকে শ্রেষ্ঠ দান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'আদব' মানে শিষ্টাচার, ভদ্রতা, উত্তম চরিত্র, সুন্দর ব্যবহার, আদর্শ রীতিনীতি। এই আরবি 'আদব' শব্দটি ইংরেজি Etiquette এবং Manners এর সমার্থক।

এ হাদীসে সন্তানদের সার্বিক সুন্দর জীবন রীতি শিক্ষা দানের দায়িত্ব পিতামাতার উপর অর্পণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আদব কায়দাই মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। সকল পিতামাতার উচিত আপন সন্তানদের সুন্দর আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া।

১৪. পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাদান ঃ এর মধ্যে রয়েছে মানসিক পবিত্রতা, শারীরিক পবিত্রতা, পোশাক পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা। কুরআন এবং হাদীসে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার মানসিকতা গড়ে তোলা কর্তব্য।

১৫. দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা ঃ বাবা মার একটি বড় কর্তব্য হলো সন্তানদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে আল্লাহ্‌র অর্থাৎ স্রষ্টার অধিকার, আর অপরদিকে রয়েছে সৃষ্টির অধিকার। প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা মানুষের কর্তব্য। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ - (بخارى)

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" [বুখারি]

এ জবাবদেহীর চেতনা সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে দিতে হবে তাদের। তাদের মাঝে এ অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে হবে যে তারা দায়িত্বহীন নয়। তারা বহু ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে তারা দায়িত্বশীল। পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে তারা দায়িত্বশীল। এ সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের বিধান দেয়া হয়েছে। সে বিধান মুতাবিক তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছে কিনা সে বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এসব ব্যাপারে বাবা মার দায়িত্ব সর্বাধিক কার্যকর।

পিতামাতার আরো কিছু কর্তব্য

সন্তানদের আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা মার আরো অনেক কর্তব্য ও করণীয় রয়েছে। আসলে বাবা মা-ই সন্তানের আসল শিক্ষক। তাই সকল বিষয়েই সন্তানদের শিক্ষাদান করা তাদের কর্তব্য। এখানে পিতামাতার আরো কতিপয় করণীয় কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ঃ

১. ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার তারতম্য করবেননা।

২. দীনি শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকলে বাড়িতে পৃথকভাবে তাদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

৩. অবশ্যি আল কুরআন পড়তে শিখাবেন।

৪. সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর ব্যবস্থা করবেন।

৫. আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষকের কাছে পড়াবেন।

৬. পানাহারের আদব কায়দা শিখাবেন।

৭. গোসল করা ও পোষাক পরার নিয়মকানুন শিখাবেন।

৮. প্রয়োজনীয় খেলাধূলা শিখার ব্যবস্থা করবেন।

৯. পারিবারিক কাজ কর্ম শিখাবেন।

১০. মেহমানদের অভ্যর্থনা জানানো এবং মেহমানদারীর আদব কায়দা শিখাবেন।

১১. আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করবেন। তাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন।

১২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা, সততা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের শিক্ষা দেবেন।

১৩. নবী রসূল ও আদর্শ মানুষদের জীবনী শুনিয়ে আদর্শ হতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৪. বীরত্ব, দৃঢ়তা অবলম্বনের শিক্ষা দিবেন।

১৫. এমনভাবে সঠিক জীবন লক্ষ্য ও জীবনোদ্দেশ্য স্থির করে দেবেন, যাতে আমৃত্যু তারা এর উপর অটল অবিচল থাকে।

১৬. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শিখাবেন।

১৭. তাদের সাথে সালামের আদান প্রদান করবেন।

১৮. তাদের সাথে কখনো মিথ্যা বলবেননা, তাদের প্রতারিত করবেননা, তাদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করবেননা।

১৯. তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, প্রয়োজনীয় শাসন করবেন এবং তাদের মহব্বত করবেন।

২০. তাদের বন্ধুদেরও সম্মান দেবেন এবং মহব্বত করবেন।

২১. নিজের সাথে করে মসজিদে নামায পড়তে নিয়ে যাবেন।

২২. শিক্ষণীয় সভা সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ে যাবেন বা যাবার অনুমতি দেবেন।

২৩. ভাল সংগি সাথি ও বন্ধু বান্ধব বাছাইতে সহযোগিতা করবেন।

২৪. কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ নেবেন। এভাবে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

২৫. প্রয়োজনীয় যিক্‌র আয্‌কার ও দোয়া শিখাবেন।

২৬. পরিকল্পিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করবেন। এটি করবেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, বাধ্য করে নয়।

২৭. যাবতীয় ব্যাপারে নিজেকেই আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে পেশ করবেন।

২৮. সব সময় ওদেরকে আশাবাদী করবেন। কোনো ব্যাপারে নিরাশ করবেননা।

২৯. শিশু সুলভ আনন্দ উল্লাসের অবকাশ দেবেন।

৩০. নিয়মিত জান্নাত ও জাহান্নামের জীবন্ত চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে তাদের যাবতীয় কাজ কর্ম পরকালের মুক্তি ও পুরস্কারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে।

৩১. তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে তুলুন। কখনো যেনো তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বৈধ সীমা পর্যন্ত তাদের মানসিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করুন।

এসব বুনিয়াদী শিক্ষা পারিবারিক জীবন থেকে যেনো সন্তানরা লাভ করতে পারে, সেদিকে বাবা মাকে অবশ্যি লক্ষ্য রাখা উচিত। বাবা মার অধিক ব্যস্ততা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিকৃতির কারণে অনেক ঘরেই এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়না। দেশীয় আদি ও পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাব আমাদের পরিবার ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

তাই আদর্শ সন্তান তৈরির জন্যে অবশ্যি পারিবারিক পরিসরে সুন্দর সুশৃংখল ও আদর্শ জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলা আবশ্যক। মনে রাখা দরকার যে, পারিবারিক শিক্ষাই মানুষের জীবন পদ্ধতিকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে। [মাসিক পৃথিবী, ঢাকা-১৯৯৬]

সাহিত্য

মুখপাত

সাহিত্য জীবনকে সুষমা মন্ডিত করে। সাহিত্য একদিকে সমাজ মানুষের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য উৎসারী জীবনবোধের প্রতিচ্ছবি এবং এ বোধের সংরক্ষক। অপরদিকে সাহিত্যই সমাজ-মানুষকে সত্য সুন্দরের নির্দেশনা দেয়, সভ্যতা সংস্কৃতিকে আবিলতা, কলুষতা ও কুসংস্কারমুক্ত করে। সৃষ্টি করে মানবতাবোধ, মননশীলতা ও মহোত্তম মানবিক গুণাবলী। তাই সাহিত্য কোনো জাতির সংস্কৃতির সংরক্ষক ও বিকাশক। সংস্কৃতি আশ্রয় নেয় সাহিত্য ছত্রে। সেখান থেকে স্থান করে নেয় পাঠকের মস্তিষ্কে। তারপর মগজ ধোলাই করে। ফলত বিকৃত সাহিত্য সমাজকে বিকৃত করে আর সুস্থ মহত সাহিত্য সমাজকে করে উন্নত বিকশিত। সাহিত্য কেবল আনন্দ রসের বাহক নয়; বরং সেই সাথে সত্যের ধারক এবং মননশীল মানুষ ও বিকশিত সমাজ গড়ার কারক।

১

সাহিত্য সন্নিধি

১. অভিধা সনাক্তি

বিশ্ব জগতের মহান স্রষ্টার সৃষ্টি অফুরাণ। তাঁর সৃষ্টির সীমা-সংখ্যা-পরিধি মানব মন তার কল্পনায় ধারণ করতে অক্ষম। কতো বিশাল, কতো বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্রাংশ এই সৌরজগত। আবার সৌরজগতের একটি ছোট্ট কণিকা হলো আমাদের এই গ্রহ, পৃথিবী। আর আমরা? হ্যাঁ, আমরা মানুষরা ক্ষুদ্র এই পৃথিবীর লাখো লাখো জীবের একটি জীব। তবে পৃথিবীর সব জীবের মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ সে এখানে স্রষ্টার প্রতিনিধি। তাইতো বিশ্ব নিখিলের মহান স্রষ্টা তাকে –

১. মনের সাথে মানস ও মননশীলতা দিয়েছেন।
২. মস্তিষ্কে দিয়েছেন চিন্তা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার শক্তি।
৩. দিয়েছেন কামনা, বাসনা, চাহিদা ও আকাংখা।
৪. দিয়েছেন ভাববার ও কল্পনা করবার শক্তি।
৫. ভালো ও মন্দ প্রকৃতি দিয়েছেন।
৬. ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন।
৭. কথা বলবার ও মনের ভাব প্রকাশ করবার শক্তি দিয়েছেন।
৮. বুঝবার ও উপলব্ধি করবার শক্তি দিয়েছেন।

৯. রূপ ও সৌন্দর্যবোধ দিয়েছেন।

১০. জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের ক্ষমতা দিয়েছেন।

১১. যুক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি দিয়েছেন।

১২. বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন।

১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি দিয়েছেন।

এ জিনিসগুলো একত্রে এবং এতো প্রচুরভাবে অন্য কোনো জীবকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া এর অধিকাংশগুলো অন্য জীবদের দেয়াই হয়নি। এগুলো দেয়া হয়েছে কেবল মানুষকে। তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব।

এই যে জিনিসগুলো মানুষকে দেয়া হলো, এগুলোই মানব সাহিত্যের উপাদান। মানুষ তার মানস প্রকাশে ব্যাকুল হয়ে উঠে। সে তার চিন্তা গবেষণা ও আবিস্কার প্রকাশ করতে চায়। তার ভাব কল্পনা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা আকাংখা এবং জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রকাশে অস্থির হয়ে উঠে। সে তার চিন্তাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমস্ত ক্রিয়া কর্মকে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে ব্যস্ত থাকে। আর যেহেতু মানুষের মধ্যে রূপবোধ ও সৌন্দর্য চেতনা অন্তরগত করে দেয়া হয়েছে, তাই তার প্রকাশ প্রক্রিয়ায় রূপ ও সৌন্দর্য চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠতে চায়। সুতরাং বলবো, জীবন ও জগতের অন্তরগত উপলব্ধিকে ভাবের ব্যাকুলতায় রূপ চিত্রময় ভংগি ও শিল্প সম্মত প্রকাশের নামই সাহিত্য।

অনুভূতিশীল মানুষের মধ্যে পরিবেশ তথা বাহ্যজগতের প্রভাব প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণশীল। বাহ্যজগত বলতে বুঝায় স্রষ্টার সৃষ্টি প্রাকৃতিক জগত আর মানব রচিত কৃত্রিম জিনিস। এই বাহ্যজগত মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করে ভাব-কল্পনা-চিন্তা। মানুষ এগুলো প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এই ব্যাকুলতা আপেক্ষিক। তবে যারা এই ব্যাকুলতাকে রূপচিত্র ও শিল্পরূপে অপরূপ করে প্রকাশ করেন, তারাই সাহিত্যিক। আর তাদের ঐ প্রকাশটাই হলো সাহিত্য। একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বলেছেন ঃ

> "সাহিত্যিক যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে আত্মগত অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা তাহার ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের বস্তু সত্তাকে প্রকাশ করেন। নিজের কথা পরের কথা বা বাহ্য জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝংকৃত হয়, তাহার শিল্প সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।"[১]

---

১. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য-সন্দর্শন, কথাকলি, ঢাকা।

সাহিত্য হবে সৃষ্টি ধর্মী, শাশ্বত, চিরন্তন ও সার্বজনীন মূল্যবোধ সমৃদ্ধ এবং শিল্পনিষ্ঠ। সাহিত্য ব্যক্তি মানস ও ব্যক্তিমনের স্বতস্ফূর্ত শৈল্পিক স্ফুরণ। তাই ব্যক্তির চিন্তাধারা দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা, জীবনদর্শন লালিত মূল্যবোধ, সমাজচেতনা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবজাত ভাবের অলংকৃত প্রকাশই হলো সাহিত্য।

সাহিত্যে ব্যক্তিমানসের মনিকোঠায় লালিত অনুভূতি অনায়াসে একান্ত আপন প্রকাশ ভংগিমায় মূর্ত হয়ে উঠে। সেখানে জ্বলজ্বল করে সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্য আর একান্ত প্রতিভার সোনালি চিহ্ন।

সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের আপনত্ব ও তার অনবদ্য সত্তা চিত্রিত হয়। এই আপনত্ব ও অনবদ্যতাই সাহিত্যকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলে। এরি ফলে সাহিত্য কর্ম হয় সার্বজনীন ও শাশ্বত। তাতে স্থান করে নেয় একটি চিরন্তন আত্মা। সে আত্মা সর্বমানবিক।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় তার দুটি দিকের বলিষ্ঠতার উপর। একটি তার অন্তর, আরেকটি তার অঙ্গ। তাতে থাকতে হবে ভাবের উদারতা, গভীরতা ও সুক্ষ্মতা। থাকতে হবে অঙ্গভরা শৈল্পিক রূপ চিত্রময় অলংকার। থাকতে হবে রূপ রস, সৌন্দর্যবোধ। সেই সাথে থাকবে জীবন দর্শন, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভংগি। সভ্যমানবের শিল্প সাহিত্য কেবল কলা কৈবল্যের (Art for art sake) জন্যে নয়। সাহিত্যে মানুষের আর্থ সামাজিক দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যা সম্পর্কে থাকবে গভীর চেতনা এবং মানুষের প্রতি থাকবে গভীরতম সংবেদন। থাকবে অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে দ্রোহ। থাকবে মানুষের সুখ শান্তি ও কল্যাণের আবেগময় আবেদন। সাহিত্য মূলত মানবমুখী, জীবনমুখী ও হৃদয় স্পর্শী। তাই সাহিত্য 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'। রবীন্দ্রনাথের মতে মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্রই সাহিত্যের বিষয়। তাঁর বক্তব্য হলো ঃ

> "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"২

মনে রাখতে হবে, সাহিত্যিককে নিজের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত ভাবের এমন এক সুর সম্মোহন সৃষ্টি করতে হবে "যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়। ...আর সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, সমস্ত প্রভাব চাপিয়ে উঠবে তার নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টি শক্তি। যে দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমা মন্ডল।"৩

---

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্য।

৩. বুদ্ধদেব বসু ঃ কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৫৯।

বাংলা সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে আমি পড়েছি। সাহিত্যের বৈশিষ্ট বিবৃতিতে যেসব বিশেষণ তাঁরা ব্যবহার করেছেন, সেগুলো স্মরণীয়। অর্থাৎ সাহিত্য হবে ভাবের শিল্প সম্মত প্রকাশ, জীবনবোধ প্রসূত, সার্বজনীন, শাশ্বত, সর্বমানবিক, সমাজ চেতনা প্রসূত,বুদ্ধিগত, জীবন দর্শন প্রসূত, বস্তুগত, মননশীল, মানসগত, আদর্শজাত, নীতি তাড়িত, কৃষ্টি তাড়িত, সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রসূত, ঐতিহ্য চেতনাগত, আত্মপ্রকাশ মূলক, ভাবগত, কল্পনাগত, রোমান্টিক, রূপ-রস-গন্ধযুক্ত, প্রকৃতি সঞ্জাত, ভাষার অপরূপ বুননে চিত্ররূপময়, উপমার অজস্রতায় ভরপুর, চিন্তাপ্রসূত, অনুভূতিপ্রসূত, আধ্যাত্মিক, রসাত্মক, নিজস্বতায় গৌরবদীপ্ত, সমাজ বিম্বিত, মূল্যবোধের ধারক, প্রাণবন্ত, চিত্তাকর্ষক, গঠনমূলক, বৈচিত্র্যময়, অলংকৃত, অকৃত্রিম।

২. রূপ প্রকৃতি

সাহিত্যের রূপ প্রকৃতি বিচিত্র। কোনো ধরা বাঁধা ছকে তাকে বিভক্ত করা কঠিন। তবু সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচকরা সাহিত্যের রূপ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। রকমভেদ উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ চন্দ্র দাসের মতে ঃ

> "যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই সাহিত্যিক এবং যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই সাহিত্যের বস্তু বা সামগ্রী। প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকা চাই। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সাহিত্যের রূপভেদ নির্দ্ধারিত হয়। যখন সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন তখনই উহাকে আমরা মন্ময় সাহিত্য বা Subjective Literature বলি। সাহিত্যে বস্তু সত্তার প্রাধান্য হইলে উহাকে তন্ময় সাহিত্য বা Objective Literature বলা হয়।"[৪]

এই বিভক্তিকে অন্যত্র তিনি ভাবের সাহিত্য ও জ্ঞানের সাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভাবের সাহিত্য শাশ্বত আর জ্ঞানের সাহিত্য সংস্কারযোগ্য।[৫]

সাহিত্যের এই বিভক্তিতে প্রশস্ততা কম। এ বিভক্তি নিরেটও নয়। এককভাবে মন্ময়তা এবং এককভাবে তন্ময়তা আদর্শ সাহিত্য হতে পারে না। এরা পরস্পরের পরিপূরক। অবশ্য শ্রীশ চন্দ্র বাবু সাথে সাথে তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

৪. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন, কথাকলি, ঢাকা।

৫. উক্ত গ্রন্থ।

এই স্থলেও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক বস্তুতন্ত্র-সাহিত্য (Realistic Literature) ব্যতীত সকল সাহিত্য কমবেশী ব্যক্তি অনুভূতি-রঞ্জিত। প্রকাশ ভঙ্গিতে কখনো সাহিত্যিকের বুদ্ধি বৃত্তি, কখনো অনুভূতি, কখনো কল্পনা বা বাণী-বিন্যাসের কলা-কৌশল মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সুসাহিত্যে উহাদের সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে; এবং তখনই ভাব, ভাষা, বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ রীতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধিত হয়।" ৬

সাহিত্যের শ্রেণী বিভাজনে ডঃ হাসান জামানের দৃষ্টি ভংগি অনেক প্রশস্ত ও উদার। তিনি সাহিত্যে রূপ-রসকে অস্বীকার করেননা। তবে, তাঁর দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিভাজন হবে মানবতাবোধ কেন্দ্রিক এবং সে হিসেবেই তিনি সাহিত্যকে বিন্যস্ত করেছেন ঃ

"এ দিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যে তিনটি স্তর আছেঃ

১. রসবান সাহিত্য, ২. মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য ও ৩. নিজস্ব জীবন বোধের মারফত মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য।"৭

ডঃ জামান তাঁর এই শ্রেণী বিন্যাসের বিশ্লেষণ দিয়ে বলেন ঃ

"সাহিত্যে লোকশিক্ষার বিভিন্ন উপাদান থাকলেও তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রস সৃষ্টি করা। ..... তবে সাধারণভাবে সাহিত্যের মৌলিক সার্থকথা নির্ধারণে নিজস্ব জীবন বোধের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। .... জগতের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মানবের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখেও ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাহিত্যকে তাই শুধু রম্য ও রসোত্তীর্ণ হলেই চলেনা, তাকে মানবতাবোধোত্তীর্ণও হওয়া চাই। জীবনের সব ছবিই সাহিত্যে পাংক্তেয় নয়। যে আলেখ্য রূপে রসে-গুণে মধুর ও মানবজীবনে সত্য ও কল্যাণকর, কেবল তাই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। দেশ-সমাজ-কাল এইসব আপেক্ষিকতাকে লঙ্ঘন করে সকল মানব সমাজের কতগুলো নীতি আছে, যা সাহিত্যের ও শিল্পের রসোত্তীর্ণতার ছোঁয়ায় অপরূপতা লাভ করে। উচুঁ দরের সাহিত্য অসুন্দর ও অকল্যাণকর হতে পারেনা। দুর্নীতি প্রচার রসোত্তীর্ণ হলেও তা উচ্চ স্তরের সাহিত্য নয়। সাতিহ্য জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জীবনকে মহিমান্বিত করে। সাহিত্যে যদি মানবতার অপমান,

৬. উক্ত গ্রন্থ।

৭ ড ঃ হাসান জামান ঃ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

নৃশংশতার উদ্রেক বা হিংসার প্রশ্রয় থাকে তবে তা রসোত্তীর্ণ হলেও বিকৃতমণা ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ভালো লাগেনা। আবার সাহিত্য যদি কেবলমাত্র আদেশ উপদেশ ভারাক্রান্ত হয় এবং তাতে রসবোধ না থাকে, তবে সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবেনা। ইকবালের 'উঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও' এবং রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, মানবতার মূর্ত প্রকাশও।"৮

সাহিত্যকে বিন্যস্ত ও বিভাজন করা হয় ভাব, বস্তু, বোধ, রূপ, রস, চিত্র, গন্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে। তবে ঐতিহ্য চেতনা, জীবনবোধ ও মানবতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে যখন রূপ, রস, গন্ধ, ভাব ও বস্তুর সম্মিলন ঘটে, তখনই সাহিত্য আত্ম প্রকাশ করে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে।

৩. সাহিত্য সামগ্রী

তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। সেগুলো হলো ঃ

১. সাহিত্যিকের মন,

২. জগতের দৃশ্য অদৃশ্য সামগ্রী বা উপাদান উপকরণ,

৩. সাহিত্যিকের প্রকাশ ভংগি।

সাহিত্যিকের মন বলতে বুঝায়, তার মনের ভাব, চিন্তা, কল্পনা, বোধ, চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধিকে।

মানুষের মনে এমনি এমনি ভাব, কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়না। তা সৃষ্টি হয় কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে। সে 'কিছু' দৃশ্যও হতে পারে আবার অদৃশ্যও হতে পারে। দৃশ্য জগত তো হলো বস্তু নিচয়। বস্তু নিচয় যেমন মানুষের মনকে নাড়া দেয়, তেমনি নাড়া দেয় অদৃশ্য জিনিসও, যেমন বিশ্বাস, শ্রুতি, অনুভূতি। মানুষ অনেক কিছু শুনে এবং অনুভব করে, কিন্তু দেখেনা। এই দৃশ্যও অদৃশ্য জগতই মানুষের মনে ভাব, চিন্তা, কল্পনা, বোধ, চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি সৃষ্টি করে। তাই এগুলোই সাহিত্যের সামগ্রী। এগুলো কেন্দ্রিক যে বোধ ও ভাব, তার শিল্প সম্মত প্রকাশইতো সাহিত্য। শ্রীশ চন্দ্র দাসের মতে ঃ

"বিশ্বপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি ও অদৃশ্য যে শক্তি মানুষেরর সুখ দুঃখ নিরপেক্ষভাবে ক্রীড়া করিতেছে তাহাও সাহিত্যের সামগ্রী, মোটকথা, বিশ্বপ্রকৃতি, ভগবান, মানব ও জীব জগত সকলই সাহিত্যের সামগ্রী। এই

৮. উক্ত গ্রন্থ।

সামগ্রী যখন সাহিত্যিকের কল্পনা রঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে-ভাবে নয়, ভাবময় রূপে, তখনই উহা সাহিত্য।"৯

৪. সাহিত্যিক সত্যতা

সাহিত্য সত্য আর বাস্তব সত্য কি এক? সাহিত্য জগতে সাহিত্যিক সত্য (Literary truth) বা কাব্যগত সত্য (Poetic truth) বলে একটা কথা আছে। এ সত্যটা কি ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক সত্যের মতো সত্য? একদল লোক মনে করেন, সাহিত্য-সত্য বা কাব্যগত-সত্য একটা শাশ্বত জিনিস। সাহিত্যে ঐতিহাসিক সত্য সন্ধান করা নিরর্থক। তাদের মতে, সাহিত্য সত্যটা হলো ভাব বা কল্পনার সত্য (Truth of Imagination), আর ভূগোল বা ইতিহাসের সত্যটা হলো তথ্য-সত্য (Truth ot fact)। যেমন রবীন্দ্রনাথের বলাকা, নজরুলের অগ্নিবীণা এবং ফররুখের সাত সাগরের মাঝিতে যে আবেদন এবং আহ্বান রয়েছে, তা শাশ্বত, সর্ব মানবিক। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ আবেদনের কোনো ব্যতিক্রম নেই। সদা সর্বত্র এ আবেদন জীবন্ত।

Hudson বলেছেন ঃ "By poetic truth we mean fidelity to our emotional apprehension of facts."

Aristotle কথাটা এভাবে বলেছেন ঃ

> "The truth of poetry is not a copy of reality, but a higher reality : What to be, not What is... Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities."

শ্রীশ চন্দ্র দাস বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> "ইতিহাস বা ভূগোলে যে সত্য তাহা তথ্য-সত্য (Truth of fact)। এই সত্য সম্বন্ধে কখনো দ্বিমত হয়না। হিমালয় ভারতের উত্তরে অবস্থিত এই সত্য সম্বন্ধে কেহ কোনদিন দ্বি-মত পোষণ করেননা। শাজাহান যেসকল অনুষ্ঠানের দ্বারা মোগল সম্রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা শুধু ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্য তাঁহার মহত্ত্ব। সেই সত্যটি, তথ্যটি নয়, পাঠকের মনে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি প্রতিভার আবশ্যকতা বেশী। এই কবি প্রতিভা যে সত্য

৯. শ্রীশচন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন।

প্রতিষ্ঠা করে, তাহার বস্তুগত সত্যতা নাই, কল্পনার সত্যতা আছে। যাহা হইতে পারে, কবি বা সাহিত্যিক তাহাকে সত্য বলিয়া অন্তর হইতে উপলব্ধি করেন। যেভাবে কবি বিষয় সন্নিবেশ ও চরিত্রাঙ্কন করেন, তাহার সম্ভাব্য সত্যতা প্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায়। রাশীকৃত তথ্য হইতে কবি কল্পনার সাহায্যে সত্যতম, নিত্যতম সত্যকে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া ঐতিহাসিকের নয়, সত্য দ্রষ্টা কবি প্রতিভার। এই জন্য কাব্য বা সাহিত্য পাঠ করিতে আমরা বর্ণিত ঘটনাবলীর যথাযথ সত্যতার জন্যে উ ৎসুক হইনা।"১০

অনেকের মতে সাহিত্যিক সত্যতার ধারণা অকাট্য ধারণা নয়, কারণ, সাহিত্য কেবল ভাবের সাহিত্যই হয়না, জ্ঞানগত, বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্য প্রসূত সাহিত্যও হয়ে থাকে।

৫. সার্বজনীন সাহিত্য

একজনের রচিত সাহিত্য কি সর্বজনের হতে পারে? একজনের মনের কথা কি সর্বমানবের মনের কথা হতে পারে? হ্যাঁ হতে পারে, যদি কবি বা সাহিত্যিক নিজের মনোবীণায় সর্ব মানবের মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন। যদি তিনি নিজের কল্প জগতে সকল মানুষের কল্পনাকে আশ্রয় দিতে পারেন। যদি তিনি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যদি তিনি শাশ্বত ও সার্বজনীন মানবাদর্শকে, মানবতাবোধকে এবং মানবাকাংখাকে সুনিপুণভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পারেন। যদি তিনি মানুষের মন, আত্মা ও বিবেককে নাড়া দিতে পারেন। যদি তিনি নিজের মধ্যে, নিজের বংশ গোত্র সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সর্ব মানবের হৃদয়াবেগ, সুখ দুঃখ, আশা আকাংখা এবং চাওয়া পাওয়াকে উপলব্ধি করতে পারেন, তবেই তার সে উপলব্ধি প্রসূত সাহিত্য সার্বজনীন সাহিত্য হতে পারে।

এজন্যে প্রথমেই প্রয়োজন সাহিত্যিকের আত্মোপলব্ধি। তিনি যদি নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেন, নিজের কল্যাণ অকল্যাণের, নিজের ভালো মন্দের, নিজের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির, নিজের বিরহ মিলনের, নিজের আনন্দ বেদনার, নিজের সুখ দুঃখের, নিজের আশা নিরাশার এবং নিজের জৈবিক ও আত্মিক চাহিদার কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে উপলব্ধিকে যদি উদার মানবতাবোধের অনুভূতিতে প্রকাশ করতে পারেন, তবে সেটাই হবে সার্বজনীন সাহিত্য।

---

১০. উক্ত গ্রন্থ।

আপনি যদি ইকবালের 'বংগে দরা', রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', ফরুখ আহমদের 'সাতসাগরের মাঝি', শরৎ চন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' ডাঃ লুৎফুর রহমানের 'উন্নত জীবন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', জসীম উদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ', গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' সৈয়দ আলী আহসানের 'অনেক আকাশ' সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' কিংবা জীবননান্দ দাশের 'বনলতা সেন' পড়ে থাকেন, তবে অবশ্যি আপনার নিজের ভাব কল্পনার, ঐতিহ্যবোধ ও জীবন চেতনার অনেক কথাই সেগুলোতে পেয়ে থাকবেন এবং এসব কবি সাহিত্যিকদের কথাকে নিজের মনের কথা বলেই উপলব্ধি করে থাকবেন। এটাই সাহিত্যের সার্বজনীনতা। যে সাহিত্যে নিজের কথা এবং পরের কথা একাকার হয়ে যায় সেটাই সার্বজনীন সাহিত্য। ফরুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী! রাত পোহাবার কতদেরী'? জীবনানন্দ দাশের 'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে' কার মনে না আবেদন সৃষ্টি করতে পারে? এটাই সাহিত্যের চিরন্তনতা, বিশ্ব জনীনতা, সার্বজনীনতা।

৬. সাহিত্যে স্টাইল ও অনন্যতা

মহান স্রষ্টা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতিগত স্বকীয়তার কারণেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা যায় স্বাতন্ত্র্য। একজন অপরজন থেকে ভিন্ন। ভিন্নতা দেখা যায় চালচলনে, আচার আচরণে, আহারে বিহারে, বাচন ভঙ্গি তথা কথনে বলনে। জগতে এমন কিছু লোক আছেন, মহান আল্লাহ যাদের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে অতি মাত্রায় স্বকীয়তা দান করেছেন। এই স্বকীয়তার ফলে তারা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। এই স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্যই তার ষ্টাইল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ষ্টাইলটাই বেশি প্রয়োজন। ষ্টাইল বা অনন্যতাই সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

এই অনন্যতা থাকতে হবে প্রধানত লেখকের ব্যক্তিত্বে, বিষয়বস্তু চয়নে এবং বাচন ভঙ্গিতে। বিষয় বিন্যাস, শব্দ চয়ন ও শিল্পরস সৃষ্টিতে লেখককে নিপুণ হতে হবে। Lucas বলেছেন ঃ

> "Style is means by which a human being gains contact with others, it is personality clothed in words, character embodied an speech."

তবে বাচনভঙ্গিই ষ্টাইলের মূল কথা। কারণ, লেখক তার বাচনভঙ্গির সাহায্যে ভাবকল্পনার বীজকে তণুশ্রী দান করে তাকে ব্যক্তিগত ভাবকল্পনার বাহন হিসেবে উপস্থাপিত করেন। আবার তাতেই নির্বিশেষ ভাব ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত প্রদান করেন। লেখক তার অনন্য বাচনভঙ্গির প্রকাশ যতোভাবে করে থাকেন সেগুলো কয়েকটি নামে বিশেষিত করা যেতে পারে ঃ

১. প্রাঞ্জলতা।
২. শুদ্ধতা।
৩. আবেগাত্মক।
৪. বর্ণনাত্মক।
৫. চিত্রাত্মক।
৬. বক্তৃতাত্মক।
৭. কাব্যধর্মী।
৮. কৌতুক রসাত্মক।
৯. অলংকৃত।
১০. জ্ঞানঘন।
১১. প্রত্যয়দীপ্ত।
১২. বৈজ্ঞানিক।
১৩. যুক্তিসিদ্ধতা।
১৪. বিরোধাত্মক।
১৫. ভাব, বিষয় ও বাচণের সুসংগঠন।

এ গুলোর মধ্যে লেখক নিজের অনন্যতা খুঁজে নেবেন, বিকশিত করবেন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন। এই ষ্টাইল বা অনন্যতাই সাহিত্যিকের মহত্ব। অনন্যতার মাঝেই লেখক বেঁচে থাকেন। অনন্যতা দিয়েই লেখক সমাজে ও বিশ্ব দরবারে নিজের স্থান করে নেন এবং অমরত্ব লাভ করেন।

৭. সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সাহিত্য সারথিরা সমন্বিত চিন্তার চৌহদ্দি রচনা করতে পারেননি। ফলে এ ক্ষেত্রে ঐকমত্য নেই, আছে বৈপরিত্য। মতের বহুগামিতা থেকে মনে হয় সাহিত্য কোনো উদ্দেশ্যহীন জিনিস নয়তো? আসলে তা নয়। স্বমতের সারথি হয়েই লোকেরা সাহিত্যকে অন্ধদের হাতি দর্শনে পরিণত করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত মতামতের সমারোহ এখানে

সুসজ্জিত করে দিচ্ছি ঃ

● কারো মতে, সাহিত্য নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম।

● কারো মতে, সাহিত্য নিছক আনন্দের উপাদান।

● কারো মতে, সাহিত্য নিছক রস উদ্দীপক।

● কারো মতে, সাহিত্য নিছক ভাষার অলংকার।

● কারো মতে, সাহিত্য জীবনের আয়না।

● কারো মতে, সাধারণের কথা সাধারণের উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে অভিজাত ও সুরুচিবান করা।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

● সাহিত্য মতবাদ প্রচার ও দৃষ্টি ভংগি সৃষ্টির হাতিয়ার।

● সাহিত্য নিছক নীতি ও উপদেশ প্রচারের বাহন।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য, মানবতাবোধ সৃষ্টি।

● সাহিত্য হলো, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের ধারক ও বাহক।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, সমাজ কল্যাণ, মানব কল্যাণ।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে তার অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক করা এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত করা।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে প্রকৃত সত্য ও সুন্দরের সন্ধান দান করা এবং সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

● সাহিত্যের কাজ হলো, মানুষকে প্রকৃত মানুষ ও সচ্চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করা।

● সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান করা।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব মতামত উল্লেখ করা হলো, এগুলোর প্রায় সবই খন্ডিত দৃষ্টিভংগি প্রসূত। আপনি আপনার মনকে প্রশস্ত করুন। দৃষ্টিভংগিকে উদার করুন। আপনি মহাকাশের কথা চিন্তা করুন। অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নিয়ে ভাবুন। আপনার জন্মের কথা ভাবুন, মৃত্যুর কথা ভাবুন। তার পরের কথা ভাবুন। আপনার জীবন ও জগতের সৃষ্টির কথা চিন্তা করুন। সব কিছুর সুশৃংখল আবর্তনের কথা ভেবে দেখুন!

তারপর এই উদার চিন্তা ও অসীম দৃষ্টিভংগির আলোকে সাহিত্যের উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করুন। এবার নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টিভংগি পাল্টে গেছে।

আশা করি এবার আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। অর্থাৎ আপনি মেনে নেবেন, উপরের খন্ডিত কথাগুলো নয়, বরং সেগুলোর সমন্বিত অভিধাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। আসলে, সাহিত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যেই সে ভাষার অলংকার আর শিল্প সৌন্দর্যে সজ্জিত হবে। এ জন্যেই সে আনন্দ, বিনোদন ও রস সৃষ্টি করবে। এ জন্যেই সে সুঃখ দুঃখ, হাসি কান্না, আনন্দ বেদনাসহ সমাজের অকাট্য চিত্রকে বুকে ধারণ করবে। সে সমাজের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হবে। অতীত ও বর্তমানের মাঝে সেঁতু নির্মাণ করবে, তৈরি করবে ভবিষ্যতের রাজপথ। এ জন্যেই সে মানব জীবন ও সমাজের সমস্ত কালিমাকে চিহ্নিত করবে, ঘৃণিত করবে; সৃষ্টি করবে মানবতাবোধ। লালন করবে মানুষের অকৃত্রিম বিশ্বাসকে, সত্য ও সুবিচারকে। সে বিকৃতি, দুর্নীতি, নৃশংসতা ও মানবতার অবমাননার বিরুদ্ধে হবে দ্রোহী। সে হবে মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল, হবে সত্যের বাহক। সে মানুষকে শিক্ষিত, দীক্ষিত, সংস্কৃতবান ও অভিজাত করে তুলবে। এভাবে সাহিত্য তার আনন্দ রস ও শিল্পসৌন্দর্যের সমস্ত সম্মোহনী শক্তি নিয়োজিত করবে মূলত মানব কল্যাণের লক্ষ্যে। মানুষের মাঝে আনন্দ বেদনা ও হাসি কান্না সৃষ্টি করে মানুষকে সে পৌঁছে দেবে চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আর এটাই সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য।

ইউরোপীয় সাহিত্যে Aristotle, Plato, Lessing, Cousin, Ruskin, Matthew Arnold প্রমুখ এ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে, জীবনে সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যিক মানব জীবনের কাহিনী থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করবেন এবং সেটাকে কল্পনার আলোকে প্রকাশ করবেন অভিনবরূপে।

কিন্তু ইংল্যান্ডে এ নীতির বিরুদ্ধে Whistler, Swinburne, Oscar Wilde প্রমুখ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা মূলত সাহিত্যে আদর্শবাদ এবং নীতিনৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা Art for Art's Sake আন্দোলন শুরু করেন। তাদের এই আন্দোলনের ফলে শিল্প সাহিত্যে নীতি বিবর্জিত উশৃংখলতার ঝড় শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সে ঝড় শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সে ঝড় সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। বাংলা সাহিত্যেও এক শ্রেণীর আদর্শ ও নীতিবর্জিত সাহিত্যিক সে ঝড়ে গা ভাসিয়ে দেন।

অথচ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণের স্পৃহাই তো সাহিত্যের মূলনীতি। সাহিত্য অবশ্যি শিল্পরস সিক্ত হবে; কিন্তু মূলনীতি থেকে

বিচ্যুত হবেনা। মূলোচ্ছেদ করলে সাহিত্য তরু লাশে পরিণত না হয়ে পারে কি? সাহিত্য তো জীবন কেন্দ্রিক। জীবন বিমুখ Art কখনো জীবন্ত হতে পারেনা, পারেনা মানুষের কল্যাণ সাধন করতে।

G.K Chesterton অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"There must always be a moral soil for any great aesthetic growth. The principle of 'arts for art's sake' is a very good principle if it means that there is a vital distinction between the earth and the tree that has its roots in the earth, but it is a very bad principle if it means that the tree could grow just as well with its roots in air."

তাই শিল্প সাহিত্য কোনোক্রমেই শুধু রসসর্বস্ব হতে পারেনা। সাহিত্য অবশ্যি রসোত্তীর্ণ হবে, তবে তাকে আবর্তিত হতে হবে সাহিত্যের মহত উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে।

৮. সাহিত্যে স্রষ্টার চিন্তা

নিখিল জগতের একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন। সকল কিছুর তিনি মূল স্রষ্টা। আদি স্রষ্টা তিনি। সৃষ্টির উদ্ভাবক তিনি। সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন তিনি। তাঁর সকল সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী বৈশিষ্ট রয়েছে। এগুলোর কোনো পরিবর্তন ও রদবদল নেই। "লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ।"

মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। মানুষকেও সৃষ্টি করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে মূল এবং আদি স্রষ্টা নয়। বরঞ্চ সে প্রকৃত স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের প্রয়াস চালায় মাত্র। মানব কর্তৃক প্রকৃত স্রষ্টার সৃষ্টিবস্তু নিচয়কে ব্যবহারের এই বিবিধ প্রক্রিয়াকেই মূলত "মানুষের সৃষ্টি" বলা হয়।

মানুষকে দেয়া হয়েছে বোধি ও প্রতিভা। এর সাহায্যেই মানুষ তার সেই কৃত্রিম সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। আবার তার মধ্যে দেয়া হয়েছে প্রবণতা। দুটি প্রবণতা। একটি ন্যায়, আরেকটি অন্যায় প্রবণতা। সুতরাং তার যাবতীয় প্রয়াসে এ দুটির কোনো না কোনোটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ন্যায় প্রবণতা মানুষের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। আর অন্যায় প্রবণতা অকল্যাণ ও অশান্তির বাহক।

মানুষ সমাজ পরিবেশে লালিত হয়। সুতরাং পরিবেশের প্রভাব থেকেও সে মুক্ত থাকেনা। তার ধ্যান ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস, মন মানসিকতা, ঝোঁক প্রবণতা,

ইচ্ছা আকাংখা, কামনা বাসনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এসব কিছু সমাজ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার বোধি ও প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এগুলো তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়। এসব প্রভাব গ্রহণকালে সেগুলো বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ন্যায় কি অন্যায়, কল্যাণকর কি অকল্যাণকর সে খেয়াল ক'জনেরই বা থাকে? যারা বিবেক খাটান, বোধিকে কাজে লাগান, কেবল তারাই সমাজ পরিবেশের অশুদ্ধ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন।

মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে, সেগুলোও এসব প্রভাব এবং প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেনা।

সাহিত্য মানুষের বোধি এবং প্রতিভার সৃষ্ট। সুতরাং যে সাহিত্যিক যে প্রবণতার অধিকারী, তার সাহিত্য কর্মে সে প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। সমাজ পরিবেশের কোনো প্রভাব কোনো সাহিত্যিকের উপর পড়ে থাকলে তার সৃষ্ট সাহিত্যে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে বৈকি।

তাইতো দেখি, সাহিত্যে সাহিত্যিকের মন মানসিকতা ও ঝোঁক প্রবণতার প্রভাব পড়ে। ধ্যান ধারণা ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব পড়ে। ইচ্ছা আকাঙ্খা ও কামনা বাসনার প্রভাব পড়ে। এ জন্যে সাহিত্যিকদের মতো সাহিত্যের লক্ষ্যও বিচিত্র। হৃৎপিন্ড আলাদা আলাদা। মনোরথ বিচিত্রগামী।

সাহিত্যের পরিচয় কি হবে? কি হবে এর ভাষা? কি হবে এর বিষয়বস্তু? কি হবে এর বাহন? এর রীতিনীতি কী হবে? উদ্দেশ্য হবে কি? এর লক্ষ্যস্থল হবে কোথায়? না কি মরুভূমির বল্গাহীন ঘোড়ার মতোন ছুটবে নিরুদ্দেশে?

এসব প্রশ্নের জবাব সব সাহিত্যিকের নিকট এক রকম নয়।

কী করে এক রকম হবে সকলের জবাব? কারণ কবি সাহিত্যিকরা তো নিজ নিজ মনোরথের সারথি। আর তাদের কারো মনোরথ উড়ে যায় 'অসীমের সন্ধানে উজ্জয়নী পুরে'। কারো কাছে বিধবার বিয়ে বিষবৃক্ষ। কেউ আবার বিধবাকে বিয়ে দিয়ে সুখ পান। মরতে চান কেউ কাশিতে। আবার কেউ সমাহিত হতে চান মসজিদের পাশে। কারো সুখ ফরমায়েশী গল্পে। তন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করে কেউ একাকার হয়ে যান লেনিনের সাথে। গভীর আঁধার কেটে কারো কাছে ভেসে উঠে আলোর গোলক। স্বপ্ন কারো কবিতা। লক্ষ্য কারো 'হেরার রাজ তোরণ।'

কোথায় সাহিত্যের গন্তব্য? সব সাহিত্যিকের আস্তানা এক তাঁবুতে নয়। সবার চোখে পৃথিবীর রং ধূসর নয়। আবার সব কবি সাহিত্যিক ইটের উপর

ইট গেঁথে প্রাসাদ গড়ার কারিগর নয়।

অনেক লোক আছে, যারা রাত দিন খেলা দেখে সময় কাটায়। অনেকে অবসর সময় সাহিত্য চর্চা করেন। অনেকে প্রচার করেন তন্ত্র মন্ত্র। দীন ধর্ম প্রচার করেন অনেকে। অনেকে গল্প গুজব করেন। মানব সেবায় ব্রত হন অনেকে।

আসল কথা হলো, মানুষের নিজেকে চেনা। তার জন্ম হলো পশুর মতো একই প্রাকৃতিক নিয়মে। কোনো বুদ্ধি জ্ঞান লাভ ছাড়াই পশু তার জীবন শেষ করে। মানুষ কিন্তু বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করে। প্রতিভা ও যোগ্যতা লাভ করে। একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে জন্ম লাভ করে দুই ধরনের জীবের দুই রকম অবস্থা হয় কেন?

মানুষ চিন্তা করলে এর জবাব খুঁজে পেতে পারে। মূলত এমন একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি এসব কিছুর কর্তা। শুধুমাত্র প্রকৃতিকে নিয়েও যদি কেউ ভাবেন, তবে চিন্তাশীল বিবেকবান ব্যক্তি এই বাস্তবতাই খুঁজে পাবেন।

আর মানুষ যে বুদ্ধি জ্ঞান এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা লাভ করেছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে চলার জন্যেই সে এগুলো লাভ করেছে। বিবেকবান মানুষের চেতনায় এই সত্য ধরা পড়তে বাধ্য। জগতের সকল প্রেরিত পুরুষ এই মহাসত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ মতো চলতে হবে। তাঁর নির্দেশকে কার্যকর করার জন্যে বিবেক বুদ্ধি খাটাতে হবে। যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। মরণের পর মানুষ আরেকটা জগতে পদার্পণ করে। একদিন এই বিশ্ব জগতের প্রলয় ঘটবে। মানুষ পুণরুত্থিত হবে। সেখানে স্রষ্টার নির্দেশ মতো চলা না চলার বিচার হবে। অতপর হয় চির শান্তি, নয় চির শাস্তি।

এখন যেসব কবি, সাহিত্যিক নিজেদের ধ্যান-ধারণায় এ বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন। স্রষ্টার সন্তোষ লাভকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছেন। এদের মনের যে ভাব-প্রবণতা তাদের কলমের মাথায় প্রকাশ পাবে, অন্যদের তা হবেনা, এ বিশ্বাস যাদের নেই। যারা স্রষ্টার সন্তুষ্টির পরোয়া করেনা, তারা তো বল্গাহীন ঘোড়ার মতোন। তাদের স্বৈরাচারী মন তাদের প্রভু।

কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি বিচিত্র। তাদের লেখার আলাদা আলাদা স্বাদ। আলাদা আলাদা গন্ধ।

পরিশেষে বলি, এ জীবনের পরে যখন আরেক জীবন আছে, সে জীবনে যখন এ জীবনের সব কাজের ফলাফল দাঁড়াবে, তখন কে না নিজ কাজের সুফল পেতে চায়? আর পরকালের সুফলটাই তো স্থায়ী। তাহলে কবি সাহিত্যিকদের নিজেদের প্রতিভাগত সৃষ্টি দ্বারা পরকালীন সুফল পাওয়ার আশা করাই উচিত নয় কি? সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির পথেই কলম চালানো কল্যাণময় নয় কি?

বস্তুত, স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভই সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্যই ফুটে উঠা উচিত আমাদের কবিতায়, সাহিত্যে। এতেই মানুষের সমস্ত কল্যাণ নিহিত। মানুষের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এটাই। আর মানুষের প্রয়োজনীয় কথাই মানুষকে বেশি আনন্দ দেয়। মানুষের সৃষ্টি হয় যখন মূল স্রষ্টার সন্তোষবহ, সেটাই হয় মানুষের সর্বোত্তম সৃষ্টি।

২

সাহিত্য সংসৃতি

সাহিত্য বিভিন্ন শাখা উপশাখা ও প্রশাখায় সংসৃত। শাখার পরিচয়ে উপশাখা প্রশাখার পরিচয়। এখানে আমরা কতিপয় শাখার কথা বলবো। আধুনিক কালে সাহিত্য প্রশাখার এমন প্রশস্ত প্রসার ঘটেছে যে, সেসব পিচ্ছিল পথে পাড়ি জমানোর মতো পাজেরো জীপ আমাদের নেই। তাই গলিতে গাড়ি ঢুকাবার চিন্তা করবোনা। আসুন সোজা পথে চলি। শুধু শাখার কথা বলি ঃ

১. কবিতা সাহিত্য,

২. প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্য,

৩. উপন্যাস,

৪. ছোট গল্প,

৫. নাটক।

১. কবিতা

কবির মনে যখন ভাবের বাণ আসে, সেভাব রসের হোক, দয়ার হোক, দ্রোহের হোক, আদরের হোক, আহ্বানের হোক, জ্বালার হোক, যন্ত্রণার হোক, সেভাব যখন অলংকৃত ভাষার বিস্ফোরণে মুক্তি পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠে, তখনই সেখানে অংকুরিত হয় কবিতার চারা। কবিতার কারুময় সংজ্ঞা দিয়েছেন কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকরা। কয়েকজনের মত এখানে নিয়ে এলাম ঃ

১. "Poetry is the best words in the best order." - Coleridge.
২. "মানব মনের ভাব কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমা মন্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপলাভ করে, তখনই উহার নাম কবিতা।" - শ্রীশ চন্দ্র দাস।
৩. "কবির বেদনা বিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভূমি। অর্থাৎ, সময় বিশেষে কোনো একটি বিশেষ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দ বেদনা যখন প্রকাশের পথ পায়, তখনই কবিতার জন্ম।" -ঐ
৪. "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings." -Wordsworth
৫. "Poetry is at bottom a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty." -Mathew Arnold.
৬. "Poetry is the nascent self consciousness of man, not as an individual, but as a sharer with others of a whole world of common emotion." Caudwel
৭. "অন্তর হ'তে আহরি বচন/আনন্দলোক করি বিরচন/গীতরস ধারা করি সিঞ্চণ/সংসার ধূলি জালে।" - রবীন্দ্রনাথ।

মূলত কবিতার জন্ম Thought', 'Imagination' এবং 'Emotion' থেকে। ভাববিষয়ের বিশ্লেষণে কবিতাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। কবিতা যখন কবির গভীর ব্যক্তি অনুভূতির উৎস থেকে উৎসারিত হয়, তখন সে কবিতাকে মন্ময় (Subjective) কবিতা বলা হয়। আবার কবিতায় যখন বস্তুজগতের প্রতিবিম্ব প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে কবিতাকে বলা হয় তন্ময় (Objective) কবিতা। তবে তন্ময় মন্ময়ের তণু নিরীক্ষণ ত্রুটিহীন হওয়া কঠিন।

কবিতার উদ্দেশ্যও কেবল আনন্দ দান নয়। ম্যথু আর্ণল্ডের ভাষায় কবিতা হলো মূলত, Criticism of life বা জীবন জিজ্ঞাসা। কবিতার উদ্দেশ্য হলো, জীবনকে সুন্দর, সুশীল ও পরিমার্জিত কর তে সাহায্য করা। বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন, 'কবিতার উদ্দেশ্য, জগতের চিত্তশুদ্ধি।' যারা মনে করেন, কাব্যের উদ্দেশ্য- 'কাব্য হিসেবে সার্থকতা অর্জন' (Its fidelity to its own nature), আমরা তাদের মত সমর্থন করিনা।

কবিতা সাহিত্যের একটি শাখা। আবার কবিতারও আছে বহু শাখা প্রশাখা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কবিতাকে মন্ময় ও তন্ময় হিসেবে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সমালোচকগণ এই দুইভাগ কবিতার শাখা নিরূপণ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ
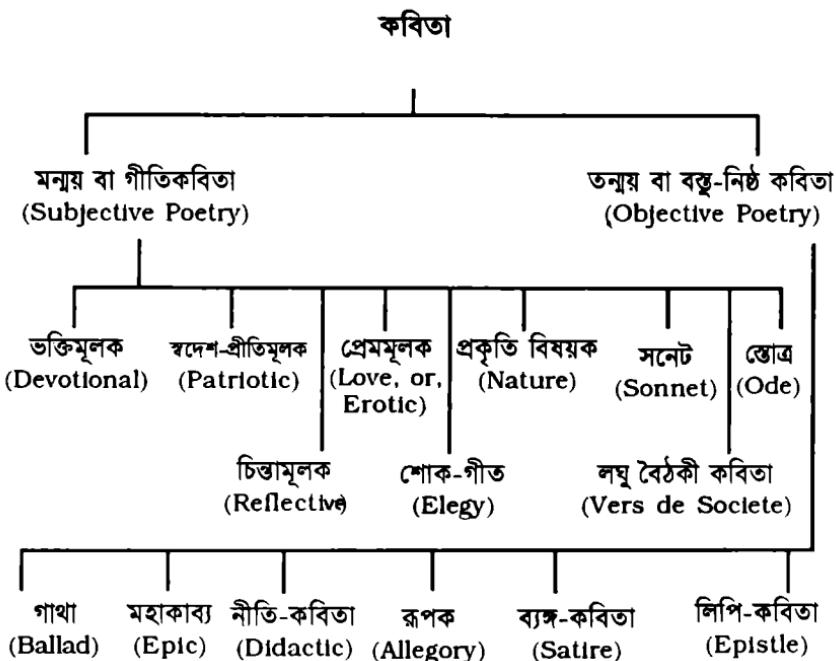
বর্তমান যুগ গদ্য কবিতার যুগ। আগে কবিতা বলতে মানুষ বুঝতো অন্তমিলের ছন্দোবদ্ধ পদ্যকে। এখন আগমন ঘটেছে গদ্য কবিতার। গদ্য কবিতার জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে। পরে মার্কিনি ও ইংরেজরা গদ্য কবিতা রচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সারা বিশ্বেই এ কবিতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গদ্য কবিতায় শব্দ চয়নের চাতুর্যের চেয়ে ভাবের গভীরে নিমগ্নতাই গুরুত্বপূর্ণ। ভাবের গতিময়তাই এর প্রাণ। গদ্য কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> "সে নাচেনা, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সে গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে ধরা

আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়। ... বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্য ছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লব পুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাঁটাছাঁটা নয়, অসম তার স্তবকগুলো, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।"

গদ্য কবিতা সম্পর্কে Richard Aldington এর বক্তব্য খুবই মাপা জোঁপা ঃ

"It forces the writer to abolish that mass of archaisms inversions, stock poeticisms, Poetic cliches, pretty and sonorous words- all the useless cumbering of the poetaster. It bring one face to face with a human personality, not with a dictionary and a Commonplace book."

পদ্য ছন্দের দুটি উদাহরণ দেখুন ঃ

(১)

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূণ্যতা ঘেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা প'ড়েছি এসে?
একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী!
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

(ফররুখ আহমদ ঃ পাঞ্জেরী)

(২)

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি,
আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসি মাখা;
সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে,
রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পটে আঁকা।

সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হরিণীর মতো
মায়াবী উচ্ছল দু'টি চোখে, তার সমস্ত শরীরে
এদেশেরই কোন এক নদীর জোয়ার বাঁধভাঙ্গা;
হালকা লতার মতো শাড়ী তার দেহ থাকে ঘিরে।

সে চায় ভালবাসার উপহার সন্তানের মুখ,
এক হাতে আঁতুরে শিশু, অন্য হাতে রান্নার উনুন,
সে তার সংসার খুবই মনে-প্রাণে পছন্দ করেছে;
ঘরের লোকের মন্দ আশংকায় সে বড় করুণ।

সাজানো-গোছানো আর সারল্যের ছবি রাশি রাশি
ফোটে তার যত্নে গড়া সংসারের আনাচে-কানাচে,
এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর এ ব্যাপারে খ্যাতি;
কর্মঠ পুরুষ সেই সংসারের চতুষ্পার্শে আছে।

(ওমর আলী ঃ এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি)

নিম্নে একটি গদ্য কবিতা উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রতিদিনই এ রকম প্রতিটি পাখিকে যেনো ক্লীপের মতোন
অই বনভূমি গেঁথে নেয় তার স্নিগ্ধ সবুজ খোপায়, ভোরবেলা
ময়ূরের পেখমের মতো খোলা রোদে বসে
ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে মিসট্রেসও আসে ইশকুলে;

কয় ঝাক বালকের নির্দোষ নিখিলভরা ক্লাস-রুমে এসেই সে অনুভব করে তার
চুলে, চোখে, চমৎকার চিত্রল গ্রীবায় সেই পাখিদের পষ্ট আক্রমণ!

ফলে স্বপ্ন নিয়ে যায় তাকে যেনো অতল স্মৃতির যুদ্ধে,
স্মৃতি তাকে নিয়ে যায় স্বপ্ন-পরাজিত এক

আত্মব্যস্ত অতীতের বিক্ষুব্ধ সীমায় আর
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসে ইশকুলে আসার পথ।

আর তাই প্রায়শঃই ক্লিষ্ট কর্ণে ভরে নিতে হয় তাকে মাঝে মাঝে
খিটখিটে হেডমিস্ট্রেসের শ্লীলতাবিহীন সাধুভাষা!

তাই শুনে করুণাতে আর্দ্র হও কখনো কি তুমি হে স্ট্রীট?
বুঝে নিতে পারো তার তীব্র তৃষ্ণা; তীব্রকাম তীব্র বেদনা?

নারী, নারীই কেবল যদি বুঝে নিতে পারে কোনো নারীর হৃদয় তবে
তুমি হে স্ট্রীট, তুমিই তো ভূখন্ডের মানে এই ঢাকা শহরের এক
সবুজ তনয়া তুমি,
তুমি কি বোঝনা তার তিরিশ বছর কাল কুমারী থাকার অভিশাপ?
বোঝনা যে তিরিশ বছর কত কাঁদায় ক্যঁকন অই পাখিদের পাষন্ড শাসন?

মিসট্রেস, কালো মিসট্রেস!
করুণ কোমল অই রোদন রূপসী মিসট্রেস।
যেনো কোনো রেফ্রিজারেটারে তার
তুমুল হৃদয়টাকে রেখে দিয়ে নষ্ট ফল,
আসে ইশকুলে, ক্লান্ত এমন অধীরা,
যেনো কতদিন সে তার নিজের মুখ মোছে না আনন্দ-অভিধায়!
অভিমানী সর্বস্ব খোয়ানো অই মেয়ে অই মানসিক শ্রমে জব্দ
জীবনধারিণী,
ওকে দয়া করো–
হে ভোর
হে স্ট্রীট
শিশুক্লাস্,
আর্টখাতা
বনের বিজন সাঁঝবেলা,
বিষণ্ন ও কুমারীকে দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো।

(আবুল হাসান ঃ মিসট্রেস ঃ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট)

২. প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্য

গদ্য সাহিত্যের আছে বিভিন্নরূপ। প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস, জীবনী, স্মৃতিকথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, পত্র ইত্যাদি। আমরা উপন্যাস ও ছোট গল্পকে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের অন্তরভুক্ত করেছি।

সাহিত্যের সবচে' বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাগ হলো, 'প্রবন্ধ সাহিত্য'। "সাধারণত, কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নীতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।"১১

প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট দুটি। এক ঃ গদ্য ভাষা, দুই ঃ নীতিদীর্ঘ আকৃতি। তবে বড় বড় সাহিত্যিকরা কখনো কখনো একেবারে হ্রস্ব এবং অতিদীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও কেবল লক্ষ্যহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি, কিংবা আনন্দ দান নয়; বরং সেই সাথে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, সমাজকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দান, মহত জীবন গঠনে প্রেরণা দান এবং মানব কল্যাণের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়তা দান।

প্রবন্ধও সাধারণত দুই প্রকার। বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ জ্ঞানের বাহক। এ ধরনের প্রবন্ধে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্মীয় আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠে।

ব্যক্তি নিষ্ঠ বা মন্ময় জাতীয় প্রবন্ধে সাহিত্যিকের ভাব কল্পনাই প্রবল হয়ে উঠে। এগুলো প্রধানত রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ জ্ঞানের বাহক। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ ভাবের বাহক। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রধান। এ ধরনের প্রবন্ধ পাঠকের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনাকে প্রখরিত করে তোলে। এ সাহিত্য যেনো সূর্যের স্বচ্ছালো। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকারদের পাঠকরা সম্মান করে এবং সম্মানের চোখে দেখে। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মনিবেদন করেন। এ ধরনের প্রবন্ধে থাকে আলো ছায়ার মিশ্রণ। এখানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ যেনো উঁকি মারে। এ ধরনের প্রবন্ধকারদের সাধারণ পাঠকরা ভালো বাসেন।

জীবন চরিত, আত্মচরিত, চিঠিপত্র প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সাহিত্যে একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে।

---

১১. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন

৩. উপন্যাস

আধুনিক কালে উপন্যাস সাহিত্যের সবচে' জনপ্রিয় শাখা। প্রশস্ত সম্ভার, বিচিত্র ধরন, নানাহ আকার আকৃতি উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। "গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয় তাহাকে উপন্যাস কহে।"১২

উপন্যাস হলো কথা সাহিত্য। তাই কথা, ভাষা, বর্ণনা ও বাচন ভঙ্গির বলিষ্ঠতা দিয়েই নির্মিত হয় উপন্যাস। কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে ঘটনাবলীর ঘূর্ণয়নেই উপন্যাসের বুনন। চরিত্র, প্লট ও পারিপার্শিক অবস্থা- এ তিনকে ঘিরেই উপন্যাসের গতি। গমনপথে তার প্লটে থাকতে হবে সাধারণত ক. প্রস্তাবনা, খ. সমস্যার সংকেত, গ. জটিল আখ্যানভাগ, ঘ. চরম সংকট মুহূর্ত ও ঙ. সংকট মোচন। এগুলো উপন্যাসের শর্ত নাহলেও স্বাভাবিক চারণক্ষেত্র।

উপন্যাস সাধারণত চার প্রকার। সেগুলো হলো ঃ

১. **ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ** অর্থাৎ ইতিহাসের কোনো ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। উর্দু সাহিত্যে নসীম হিজাজীর উপন্যাস সমূহ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

২. **সামাজিক উপন্যাস ঃ** এ ধরনের উপন্যাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা চিত্রিত হয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস সমূহ শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস।

৩. **কাব্যধর্মী উপন্যাস ঃ** এরূপ উপন্যাসে লেখকের কবিত্ব ফুটে উঠে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা।'

৪. **ডিটেকটিভ উপন্যাস ঃ** এ ধরনের উপন্যাসে লোম হর্ষক কাহিনী বর্ণিত হয়।

এর বাইরেও আরো কয়েক প্রকার উপন্যাস আছে। যেমন ঃ বীরত্ব ব্যঞ্জক উপন্যাস, গাঁথা কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস, ভৌতিক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস, হাস্যরসাত্মক উপন্যাস, বিপ্লব আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস, পরিপূরক উপন্যাস এবং সমাপক উপন্যাস। তবে এগুলোর চেয়ে প্রথমোক্ত চার প্রকারের উপন্যাসের চর্চাই বেশি।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দোপধ্যায়ের নিম্নোক্ত কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

---

১২. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন

"আধুনিক উপন্যাস সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিজ্ঞানের, অপরিক্ষিত মত মানস ও জিজ্ঞাসা কৌতুহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে, পটভূমিকার অনির্দেশ্য বিশালতায় ইহার আকৃতি প্রকৃতির বিশেষরূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

৪. ছোট গল্প

ছোট গল্পের সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। উপন্যাসও গল্প বটে। তবে সেটার আকৃতি প্রকৃতি বড় এবং প্রশস্ত। ছোট গল্প হয় আকারেহ্রস্ব। ছোট গল্পের লেখক জীবনের খন্ডাংশকে নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলেন। এর সূচনা ও সমাপ্তি হয় নাটকীয়। আসলে জীবনের খন্ডিতাংশের মধ্যে সামগ্রিকতার দ্যোতনা এবং একটি পরিপূর্ণতার বাণীরূপই ছোটগল্প। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে ঃ

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

এডগার এ্যালান পো বলেছেন ঃ "যে গল্প এক বা অর্দ্ধ হইতে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করা যায়, তাহাকে ছোট গল্প বলে।"

H.G. Wells বলেন ঃ ছোট গল্প ১০ থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করার মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছোটগল্প মূলত লেখকের আত্মসচেতন সৃষ্টি। ছোট গল্পের মাধ্যমে লেখক পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতিকে গভীর ও তীব্রভাবে আলোড়িত করেন। এতে লেখক সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার সুনিবিড় বন্ধন ও ঐক্যের ভিত্তিতে Plot তৈরি করেন। সংকেত, ইংগিত ও সুক্ষ্ম রেখা চিত্রের মাধ্যমে লেখক এখানে চরিত্র অংকণ করেন। স্বচ্ছ, সাবলীল ও গতিশীল কথোপকথনের মাধ্যমে চরিত্রকে সতেজ করে তোলেন। ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, সুক্ষ্ম ও দীপ্ত

ব্যঞ্জনা সৃষ্টি। আর এ ব্যঞ্জনার উপাদান ও বিন্যাস একটিমাত্র ভাব রসকে কেন্দ্র করে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে।

ছোটগল্প সমাজের আয়না। এর উদ্দেশ্য অনুভূতি নিবিড় রস সিঞ্চনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের ভেতরকার যাবতীয় আবীলতা দূর করে সুখ শান্তিময় অনাবিল সমাজের সন্ধান দান।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ছোট গল্পের একটি সম্রাজ্য।

ছোট গল্পের শ্রেণী বিভাগ করা কঠিন। তবে ভাব ও বিষয়ের আলোকে কেউ কেউ নিম্নরূপ ভাগ করেছেন ঃ

১. সামাজিক, ২. প্রেম বিষয়ক, ৩. হাস্য রসাত্মক, ৪. প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক, ৫. অতি প্রাকৃত, ৬. ঐতিহাসিক, ৭. উদ্ভট, ৮. গ্রার্হস্থ্য, ৯. মানবিক, ১০. প্রতীকি, ১১. বৈজ্ঞানিক, ১২. মনস্তাত্ত্বিক, ১৩. বাস্তবনিষ্ঠ, ১৪. ডিটেকটিভ, ১৫. ভৌতিক।

৫. নাট্য সাহিত্য বা নাটক

এককালে নাটককেও একশ্রেণীর কাব্য মনে করা হতো এবং কাব্যিক রীতিতেই তা লিখিত ও অভিনিত হতো। আধুনিক কালে নাটক গদ্যরীতিতেই অধিকতর লেখা হয়। নাটক হলো অভিনয়ের শিল্প। থিয়েটর বা রঙ্গমঞ্চ ছাড়া এর পূর্ণতা সাধিত হয়না।

নাটক সংলাপ নির্ভর জীবন চিত্র। প্রতীকি অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকে সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। "Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre."[১৩]

নাটকে স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবতার সাথে মিল থাকতে হয়। এখানে জীবনের সংঘাতময় আবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস, যৌক্তিক বিবর্তন, ঘটনার নিপুণ বুনন ও শৈল্পিক পারদর্শিতায় উপস্থাপন করতে হয়।

আধুনিক কালে নাটক থিয়েটার তথা রঙ্গমঞ্চের চাইতেও অধিকতর অভিনিত হয় রেডিও টেলিভিশনের জন্যে। অর্থাৎ নাটক এখন অডিও ভিডিও পর্যায়ে ব্যাপক স্থান করে নিয়েছে। সেজন্যে অভিনয়ের ষ্টাইলেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

নাটকের উদ্দেশ্যও তাই, যা উপন্যাস বা ছোটগল্পের। পার্থক্য শুধু উপস্থাপন ও পরিবেশনের। তবে নাটক অভিনিত হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য অর্জনে অন্য সকল সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার চাইতে কার্যকর।

---

১৩. Elizabeth Drew : Discovering Drama,

কাহিনী ও বিষয় বস্তুগত বৈশিষ্টের দিক থেকে নাটককে চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. ঐতিহাসিক,
২. পৌরাণিক,
৩. সামাজিক
৪. রূপকথা বিষয়ক বা কাল্পনিক।

আকার আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে নাটক তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. মহানাটক,
২. নাটিকা,
৩. একাঙ্কিকা।

রসব্যঞ্জনা পরিণতির দিক থেকে নাটক তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. মিলনান্তক (Comedy),
২. বিষাদান্তক (Tragedy),
৩. প্রহসনমূলক (Farce)।

এছাড়াও বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণে নাটককে আরো কয়েক প্রকারে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন ঃ

১. গীতিনাট্য (Opera)।
২. নৃত্য নাট্য (Dance Drama)।
৩. চরিত্র নাটক।
৪. উপন্যাস নাটক।
৫. অতিনাটক (Melodrama)
৬. সাংকেতিক নাটক (Symbolic Drama)
৭. সমস্যামূলক নাটক।

যেকোনো নাটক পঞ্চাংকে বিভক্ত থাকে। সেগুলো হলো ঃ

১. প্রারম্ভ/প্রস্তাবনা/সূচনা (Exposition).
২. প্রবাহ বা জটিলতা সৃষ্টি (Growth of Action)
৩. উৎকর্ষ বা ঘটনার ঘণিভূত অবস্থা (The Climex),
৪. সংকট মোচন।
৫. উপসংহার।

নাটকের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নাটকে একদিকে চিত্রিত হতে হবে সমাজের বাস্তব ছবি। অপরদিকে প্রতিফলিত হতে হবে সুস্থ সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে রুচি, শালীনতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় মূল্যবোধকে কিছুতেই বিসর্জন দেয়া যায়না।

ইসলামী সাহিত্য

১. ইসলামী সাহিত্য হলো মহত সাহিত্য

সাহিত্যকে কোনো জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং অঞ্চল ও আদর্শের ভিত্তিতে ভাগ করা যায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বলবো, নাকি 'না' বলবো, সে সম্পর্কে প্রত্যয়ের সাথে কেউ কিছু না বললেও প্রত্যাদেশ আছে। মহান প্রভু তাঁর প্রত্যাদেশে বলেছেন ঃ

"And the Poets,
It is those straying in evil,
Who follow them:
Seest thou not that they
Wander distracted in every Valley?
And that they say
What they Practise not?
Except those who believe,
Work righteousness, engaged much
In the remembrance of Allah,
And defend themselves after
They are unjustly attacked,

And soon will the unjust
Know what vicissitudes
Their affairs will take."১৪

আল কুরআনের এ আয়াতগুলোকে যদি আমরা বাংলায় ভাষান্তর করি, তবে তা এমনটি দাঁড়ায় ঃ

"আর কবিদের কথা!
ওদের অনুসারী তারা, বিভ্রান্ত যারা।
তুমি কি দেখনা,
এই কবিরা প্রতি উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়
উদ্‌ভ্রান্তের মতো?
আর বলে বেড়ায় এমনসব কথা
নিজেরা যা করেনা মোটেও?
তবে তাদের কথা আলাদা,
যারা আনে ঈমান, করে কাজ শুদ্ধতার,
বেশি বেশি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে আর
নিপীড়িত হলেই কেবল প্রতিরক্ষা করে তার;
যালিম অচিরেই জানবে নিপীড়নের পরিণাম তার।"১৫

এই প্রত্যাদেশ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, কবি সাহিত্যিক মৌলভাবে দুই প্রকার ঃ

১. বিপথগামী, উদ্‌ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ।

২. ঈমানদীপ্ত আল্লাহ্‌মুখী, শুদ্ধতার কর্মী ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী।

পরিষ্কার হলো, দুই ধরনের কবি সাহিত্যিকের মানস প্রসূত সাহিত্যকর্মও দুই প্রকার ঃ

১. বিভ্রান্ত, বিপথগামী, অশুদ্ধ, অশ্লীল, অসংস্কৃত, পুঁতিগন্ধময়, অহিতকর সাহিত্য।

২. ঈমানদীপ্ত, আল্লাহ্‌মুখী, অনাবিল শুদ্ধ সংস্কৃত এবং মানবতার মঙ্গল ও কল্যাণমুখী সাহিত্য।

সাহিত্যের এ বিভাজনই প্রকৃত বিভাজন। প্রথমোক্ত সাহিত্য শয়তানি সাহিত্য আর শেষোক্ত সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য তথা মহত সাহিত্য। আজ একথা তো বিশ্ব স্বীকৃত, মহাকবি মিল্টনের Paradise lost কে তার 'To

১৪. Al-Quraan 26 : 224-227, Poetic translation by Abdullah Yusuf Ali.
১৫. আল কুরআন ২৬ঃ ২২৪-২২৭

justify the ways of God to man' এ উদ্দেশ্যই মহত্ত্ব দান করেছে, মহাকাব্যে উন্নীত করেছে।

তাছাড়া সাহিত্যকে যদি ফরাসি সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, মার্কিন সাহিত্য, গ্রীক সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য, ইহুদি সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য, আইরিশ সাহিত্য, ইরানি সাহিত্য ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা যায় এবং এসব সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করা যায়, তবে কেন ইসলামী সাহিত্য ও অনৈসলামী সাহিত্যে বিভক্ত করা যাবেনা?

Watter Pater-এর মতো উঁচু মানের শিল্প সাহিত্য সমালোচকও মনে করেন, 'Good art' এবং Great art-এর মতো সাহিত্যেও Good literature এবং Great literature হতে পারে। তাঁর মতে, যে সাহিত্য মানুষের সুখ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, নির্যাতিত মানবতাকে পরিত্রাণের সন্ধান দেয়, অথবা প্রাচীন বা আধুনিক কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি এমনভাবে সাহিত্যে পরিবেশন করে, যার ফলে আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, কিংবা আমাদের এই দুঃখ কষ্টময় পৃথিবীর জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে তোলে, অথবা আমাদের মাঝে আল্লাহ্ প্রীতি সঞ্চার করে, তবে সেটাই মহত সাহিত্য (Great literature)।১৬

ইসলামী সাহিত্য মূলত মহত সাহিত্য।

২. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলামী সাহিত্য

ইসলামী সাহিত্য আজ ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। ইসলামী সাহিত্য নির্ণয়ে অজ্ঞতা, ইসলাম প্রিয়দের সাহিত্যে অনাসক্তি আর ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তব ক্ষেত্রে অনুপুস্থিতি এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ফলে-

১. কেউ মনে করে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো দৃষ্টিভংগিজাত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য।

২. কেউ মনে করে, মুসলমান নামধারী কোনো ব্যক্তির রচিত সাহিত্য হলেই তা ইসলামী সাহিত্য।

৩. অপর কেউ মনে করে, প্রচলিত মুসলিম সমাজের ছবি চিত্র সম্বলিত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য।

৪. আবার কারো মতে, নিখুঁত ইসলামী দর্শনের প্রতিফলনজাত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য।

---

১৬. দ্রষ্টব্য ঃ Watter Pater : Appreciations.

ইসলাম একটি আদর্শ। এ আদর্শের প্রতিফল ঘটে যে সাহিত্যে তাই ইসলামী সাহিত্য। এ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় রচিত হতে পারে। যেহেতু ইসলাম একটি জীবন ও জীবনাদর্শ, তাই এ জীবন দর্শনের যথার্থ উপস্থাপনা যে সাহিত্যে থাকবে সেটা হবে ইসলামী সাহিত্য। অপরদিকে এ জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠে যে সমাজ, সে সমাজের ছবি অংকিত হয় যে সাহিত্যে সেটাও ইসলামী সাহিত্য।

মুসলিম নামধারীর রচিত সাহিত্য হলেই ইসলামী সাহিত্য হয়না। মুসলিম সাহিত্য আর ইসলামী সাহিত্য এক জিনিস নয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে রচিত মুসলমানদের অধিকাংশ পুঁথি সাহিত্যই মুসলিম সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নামধারী শামসুর রাহমান, আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী, শওকত উসমান, মীর মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখদের সাহিত্যের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের কেউ ইসলামকে বিকৃত করেছে, কেউ আবার ইসলাম দ্রোহী। এদের সাহিত্য ইসলামের জন্যে ঘাতক ব্যাধি।

এছাড়া মুসলিম অমুসলিম এমন কিছু সাহিত্যিক ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন, তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো বা আছে তা আমরা বলবোনা, তবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অবশ্যই আছে। তাই এদের সাহিত্যে ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামের চিত্র যথার্থভাবে চিত্রিত হয়নি। কোথাও বিকৃত হয়েছে, কোথাও বিকশিত হয়নি। কোথাও এসেছে অভ্রান্ত চিত্র, কোথাও বিভ্রান্ত।

৩. ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো মানবতার কল্যাণ। তাই ইসলাম হলো মানবতার ধর্ম। অন্য সকল ক্রিয়াকর্মের মতো ইসলামে সাহিত্য সংস্কৃতির উদ্দেশ্যও মানবতার কল্যাণ সাধন। মানুষকে তার ইহ ও পারলৌকিক সুখ শান্তি কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. এ সাহিত্য পাঠককে এক আল্লাহ্‌মুখী করে। পাঠকের অন্তরে পরম আল্লাহ্ প্রীতি ও চরম আল্লাহ্‌ভীতি সৃষ্টি করে। পাঠককে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের অনুসারী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

২. এ সাহিত্য পাঠককে রিসালাতের আদর্শের অনুগমন ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. এ সাহিত্য পাঠকের মধ্যে পারলৌকিক মুক্তির তীব্র চেতনা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের চেতনা এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের তীব্র আকাংখা সৃষ্টি করে।

৪. ইসলামী সাহিত্য মানবতাবোধোত্তীর্ণ সাহিত্য। এ সাহিত্য মানবতার ঐক্যপ্রয়াসী। বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাববার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

৫. এ সাহিত্য মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও পরিত্রাণের সন্ধান দেয়। এ সাহিত্য ভ্রাতৃত্ববোধের আহবায়ক।

৬. এ সাহিত্য মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ নির্দেশ দান করে। মানব কল্যাণই ইসলামী সাহিত্যের মূল ধারা।

৭. এ সাহিত্য মানুষের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, সহানুভূতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে।

৮. ইসলামী সাহিত্য অনাবিল আনন্দ-রসের বাহক। নোংরামি, লাম্পট্য ও মানবতার মর্যাদা হানিকর সবকিছুই এখানে অপাংক্তেয়।

৯. ইসলামী সাহিত্য সুন্দর ও বিকশিত জীবন গড়ার হাতিয়ার।

১০. ইসলামী সাহিত্য মানুষকে হতাশা, নিরাশা ও নিরানন্দের জীবন থেকে মুক্তি দেয় এবং আশাবাদী আনন্দময় জীবন দান করে।

১১. ইসলামী সাহিত্য শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা সঞ্চারক।

১২. ইসলামী সাহিত্য উন্নত সংস্কৃতি ও মানবিক সভ্যতার প্রেরণা সঞ্চারক। হিংসা, বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও গোঁড়ামির স্থান এ সাহিত্যে নেই।

১৩. ইসলামী সাহিত্য একই সাথে দেহ মন ও আত্মার বিকাশক।

১৪. ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতির বাহক। এ সাহিত্যে অশ্লীলতা অপাংক্তেয়।

১৫. সত্য ও সৌন্দর্য ইসলামী সাহিত্যের অনিবার্য অংগ। এ সাহিত্য মূলত সত্য ও সুন্দরের আহবায়ক।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখা অর্থাৎ কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্পসহ সাহিত্যের সমস্ত ধারা যখন উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্টকে ধারণ করে রচিত ও নির্মিত হবে, তখনই তা হবে ইসলামী সাহিত্য তথা মানব কল্যাণের সাহিত্য।

ইসলামী সাহিত্য প্রসংগে আলোচনার শুরুতে আমরা আল কুরআনের ২৬ নম্বর সূরার (সূরা আশ শোয়ারা) ২২৪-২২৭ আয়াত উল্লেখ করেছিলাম। আয়াতগুলোতে কবি সাহিত্যিকদের দু'টি বিপরীত ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শয়তানি বৈশিষ্টের পংকিল ধারা আর অপরটি ঈমানি বৈশিষ্টের পবিত্র ধারা। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে একজন খ্যাতনামা তফসীরকার লিখেছেন, অনৈসলামী কবি সাহিত্যিক এবং তাদের আসরের অবস্থা হলো ঃ

"সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতাবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন দেহ পশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে। কোথাও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র আসর ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এসব মজলিসে কবির কবিতা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় এবং বড় বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখে কোন ব্যক্তি একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার স্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও পাপ-পংকিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী, দুনিয়ায় মানুষের যে কোন উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যও থাকতে পারে–এ চিন্তা কখনো তাদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারেনা।"

তিনি লিখেছেন, এসব কবি সাহিত্যিকের অবস্থা হলো ঃ

"তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বল্লাহারা অশ্বের মতো পথে বিপথে মাঠে ঘাটে সর্বত্র উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, কামনা-বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কণ্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয়না।

কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার সপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবার একেবারে পুঁতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত হতে থাকে। কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীর গর্ভে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কঞ্জুশকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর রুস্তম গণ্য করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধেনা যদি তার সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলংকিত করার এবং তার ইজ্জত-আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করেনা। আল্লাহ্ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা-অপরিচ্ছন্নতা, গাম্ভীর্য ও হাস্য-কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে।"

"তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্য এমন উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হবে যেন মনে হবে তাদের চেয়ে বড় আর কোন দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে বুঝা যাবে তারা বড়ই কৃপণ। বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু নিজেরা হবেন কাপুরুষ। অমুখাপেক্ষিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ হবে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু কিন্তু নিজেরা লোভ, লালসা ও আত্ম বিক্রয়ের শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাবেন।"

পক্ষান্তরে মুমিন কবি সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট হলো ঃ

"এক ঃ তারা মুমিন অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবগুলো তারা মানেন এবং আখেরাত বিশ্বাস করেন।

দুই ঃ নিজেদের কর্মজীবনে তারা সৎ, তারা ফাসেক, দুষ্কৃতিকারী ও বদকার নন। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেননা।

তিন ঃ আল্লাহ্কে তারা বেশী বেশী করে স্মরণ করেন, নিজেদের সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্র আনুগত্য রয়েছে। তাদের কবিতা পাপ-পংকিলতা,

লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ নয়। আবার এমনও নয়যে, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ্‌র স্মরণের কোন চিহ্নই নেই। আসলে এ দু'টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয়। তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তি জীবন যেমন আল্লাহ্‌র স্মরণে পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত যা আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহ্‌কে জানে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাদের পথ।

চতুর্থ বৈশিষ্ট হলো ঃ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করেনা এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায়না। কিন্তু যখন যালিমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তার কণ্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় আবেদন নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া মুমিনের রীতি নয়। এ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক কবিরা ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের যে তান্ডব সৃষ্টি করতো এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বিষ ছড়াতো তার জবাব দেবার জন্য নবী (স) নিজে ইসলামী কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন।"[১৭]

---

১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শোয়ারা ঃ টীকা ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫।

৪

সাহিত্য মান

অনেকে 'সাহিত্য মান' বলতে বুঝেন ভাষা, বাচনভংগি, শিল্প-সৌষ্ঠব, রসোত্তীর্ণতা, ভাববোধ এবং ছন্দ ও অলংকারের পরিপাটি। আমাদের মতে এগুলো সাহিত্যিক মানের একদিক মাত্র। অর্থাৎ দৈহিক দিক। কিন্তু সাহিত্য মানোত্তীর্ণ হতে হলে তাকে দ্বিতীয় দিকটিতেও উত্তীর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে নৈতিকবোধ উত্তীর্ণও হতে হবে।

ইংরেজি সাহিত্যে পিউরিটানগণ যে কাব্যে নৈতিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি, তাকে সাহিত্যিক মার্যাদা দিতে অস্বীকার করতেন। গ্রীক দার্শনিক Plato মনে করতেন আর্ট একটি নীতি বিবর্জিত সৃষ্টি। এর দ্বারা মানুষের নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়না, তাই তিনি এটাকে গ্রহণ করতে পারেননি।

ইংরেজি সাহিত্যের ভিক্টোরিয়ান যুগে সাহিত্য নৈতিক মান উত্তীর্ণ না হলে তো সেটা সাহিত্য হিসেবে গৃহীতই হোতনা। ইংরেজি সাহিত্যের অনিন্দ নক্ষত্র কার্লাইল, টেনিসন প্রমুখতো নীতিকে সাহিত্যের প্রধান অংগই বানিয়ে নিয়েছিলেন।

আমাদের মতে সাহিত্যকে অবশ্যি শিল্প সুষমা মন্ডিত হতে হবে, রসোত্তীর্ণ হতে হবে, অলংকারের রূপসজ্জায় সুসজ্জিত হতে হবে। কিন্তু সেই সাথে তাকে রুচিবোধ ও নৈতিকবোধে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বর্তমান। একটি হলো জৈবিক সত্তা এবং আরেকটি হলো নৈতিক সত্তা। এই নৈতিক সত্তাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানুষকে দিয়েছে মানবিক মর্যাদা। যে শিল্প সাহিত্যে নীতি নৈতিকতাকে অস্বীকার করা হয়, সেটা মূলত মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। Matthew Arnold তো পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

"A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life; a poetry of indifference to moral ideas is a poetry of indifference towards life."১৮

যে সাহিত্য শিল্প ও রসে উত্তীর্ণ হয়না সেটা যেমন সাহিত্য পদবাচ্য আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়, ঠিক তেমনি রুচি ও নীতিবোধ বিবর্জিত শিল্প-রসও সাহিত্যের সীমানায় পা বাড়াবার যোগ্য নয়। নিরস নীতিকথা ও উপদেশমালা যেমন সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ হয়না, তেমনি কুরুচি ও অশ্লীলতার বোধ সঞ্চারক এবং দুর্নীতি ও নির্দয়তার উদ্বোধক কোনো লেখাও সাহিত্যের জগতে নাম লেখাবার যোগ্য হতে পারেনা।

যে সাহিত্য মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, সেটা কি করে সাহিত্য হতে পারে? সাহিত্য তো সেটাই, যেটা শিল্প-রসে গুণান্বিত হয়ে মানুষের মাঝে মানবতাবোধ উদ্রেক করে, মানুষকে সুসভ্য করে তোলে এবং মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে অনুপ্রাণিত করে।

সত্য ও সুন্দরের ধারক সাহিত্যই সুসাহিত্য। বিকৃতি কখনো সুকৃতি হয়না। দুর্নীতি কখনো সুনীতি হয়না। কুরুচিকে কিছুতেই সুরুচি বলা যায়না। আদি অশ্লীল রসতো পশুদের জন্যেই মানায়, মানুষের জন্যে নয়।

মানুষের মাঝে কেবল পাশবিক সত্তাই নেই, তার মধ্যে বিবেক বিবেচনাবোধও আছে। মানুষের মাঝে কেবল উদগ্র জৈবিক কামনাই নয়, সেই সাথে পূত আত্মিক বাসনাও রয়েছে। এ দুটির সমন্বয়েই গঠিত হয় সুসাহিত্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহত সাহিত্য। এতদোভয়ের সমন্বয়েই সাহিত্যিক মান বিবেচিত হয়। T.S. Eliot যথার্থই বলেছেন ঃ

"We shall certainly continue to read the best (literature) of its kind of what our time provides, but we must tirelessly criticise it according to our own principles. The greatness of literature can not be determined solely by leterary standars though we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standars."১৯

---

১৮. Matthew Arnold: Essays in Criticism

১৯. T.S. Eliot: Religion and literature: Selected Essays.

বিশ্বের প্রতিটি জাতিরই রয়েছে নিজস্ব বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস উৎসারিত জীবনবোধ ও জীবনধারা। রয়েছে নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চেতনা। রয়েছে তাদের নিজস্ব নীতিবোধ এবং অন্যান্য নিজস্বতা। শিল্প রসের সাথে সাথে এসব নিজস্বতার নিরিখেই নির্ণিত হবে সাহিত্যিক মান। মনে রাখতে হবে সাহিত্য জীবন বিমুখ নয়, বরং জীবনবোধ উৎসারিত।

সমাজ মানুষের বিশ্বাস ও জীবনবোধের সাথে সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভংগিজাত অলংকৃত বাক্য সমষ্টি সাহিত্য হতে পারেনা। সাহিত্য মান বিচারের মাপকাঠি হলো ঃ

১. অলংকৃত ভাষা/ছন্দ বৈচিত্র্য।
২. শিল্প সৌষ্ঠব।
৩. রসবোধ ও রুচিবোধ।
৪. বাচনভংগি/উপস্থাপনার অনন্যতা।
৫. সমাজবোধ উৎসারিত আত্মচেতনাবোধ/জীবনবোধ।
৬. নীতিবোধ/নৈতিক মূল্যমান।
৭. ঐতিহ্যবোধ।
৮. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য।
৯. সত্য ও সৌন্দর্য চেতনা।
১০. মানবতাবোধ/উদার মানস।
১১. মানবতার কল্যাণ চেতনা।

বলগাহীন ঘোড়ার দৌড় যতোই হাস্যরস উদ্রেক করুক তা মানবতার কল্যাণে নিরর্থক। পক্ষান্তরে বলগাধারী যুদ্ধনিপুণ ঘোড়া একাধারে রসোত্তীর্ণ, শিল্পোত্তীর্ণ মানবতার কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতীক। সাহিত্য ঘোড়ার মান নির্ণয়ে তাহলে আপনি কোন্ নীতি অবলম্বন করতে চান? বলগাহীন নাকি বলগাধারী?

গ্রন্থ সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন, তাফসীর, কুরআনের বিষয় ও আয়াত নির্দেশিকা, হাদীস

১. আল কুরআন।
২. ইমাদুদ্দীন আবীল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। সপ্তম মুদ্রণ, দারুল কুরআনুল করীম, বৈরুত ১৯৮১।
৩. শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান ও শিব্বীর আহমদ উসমানি ঃ কুরআনুল করীমের তরজমা ও তাফসীর (তাফসীরে উসমানি), বাদশা ফাহদ কুরআন ফাউন্ডেশন ১৯৮৯ সংস্করণ।
৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।
৫. আমীন আহসান ইসলাহি ঃ 'তাদাব্বুরে কুরআন'। ফারান ফাউন্ডেশন, লাহোর, ৪র্থ সংস্করণ।
৬. A. Yusuf Ali : 'The Holy Quran : Text, Translation and Commentary.
৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তরজমায়ে কুরআন মজীদ। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।
৮. আশরাফ আলী থানবি ঃ বয়ানুল কুরআন।
৯. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি ঃ মু'জামুল মুফাহ্হারাস লি আলফাজিল কুরআনীল করীম। দারুল হাদীস, কায়রো ১৯৮৭ সংস্করণ।
১০. সাইয়েদ মওদূদী ঃ ইশারিয়া তাফহীমুল কুরআন। ইদারায়ে মা'আরিফে ইসলামী, লাহোর।
১১. মুহাম্মদ শফী ঃ মা'আরিফুল কুরআন।
১২. সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী।
১৩. মিশকাতুল মাসাবীহ।

অভিধান

১৪. Milton Cowan : A Dictionary of Modern Written Arabic. Macdonald & Evans Ltd. London, Third Printing 1974.
১৫. Zillur Rahman Siddiqui : Bangla Academy English-Bengali Dictionary, 1st Edition 1993.
১৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ডঃ শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা।
১৭. অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৮ কলিকাতা।
১৮. জামিল চৌধুরী ঃ বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১৯. M.M. Picthal : Cultural Side of Islam. Second Edition, New Delhi 1981.

২০. Muhammad Qutub : False God of the Twentieth Century. মুহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' শিরোনামে অনূদিত। প্রথম প্রকাশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬।

২১. আবুল মনসুর আহমদ ঃ বাংলাদেশের কালচার।

২২. মোতাহার হোসেন চৌধুরী ঃ সংস্কৃতি কথা।

২৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।

২৪. ডঃ হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৫. গাজী শামছুর রহমান ঃ শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য। শিশু একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪।

২৬. প্লেটো ঃ রিপাবলিক। সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত। বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩।

২৭. The Hundred : Michel Hurt, 'শ্রেষ্ঠ ১০০', শিরোনামে বাংলায় অনূদিত এবং ঢাকাস্থ পরশ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

২৮. ডঃ খুরশীদ আহমদ ঃ নেযামে তা'লীম ঃ আই,পি,এস, ইসলামাবাদ, ১ম সংস্করণ।

২৯. মুসলিম সাজ্জাদ ঃ ইসলামী রিয়াসাত মে নেযামে তা'লীম। আই,পি,এস, ইসলামাবাদ।

৩০. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ঃ শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা।

৩১. প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম ঃ ইসলাম কা নেযামে তা'লীম। লাহোর ১৯৯৩।

৩২. Report of the commission on National Education, Government of Pakistan (Sharif Commission Report) 1959.

৩৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত্-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট) ১৯৭৪।

৩৪. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজ উদ্দীন আহমদ কমিশন রিপোর্ট) ১৯৮৮।

৩৫. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা ঃ আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত ঃ সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৭।

৩৬. তা'লীম ও তারবীয়াত ঃ আফজাল হোসাইন। মাকতবা ইসলামী, নতুন দিল্লী।

৩৭. আবদুস সাত্তার ঃ আলীয়া মদ্রাসার ইতিহাস, মোস্তফা হারুন অনূদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০।

৩৮. মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম ঃ প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩।

৩৯. মোহাম্মদ আজহার আলী ঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন। বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮২।

৪০. প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম ঃ হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানূঁকা নিযামে তা'লীম ও তারবিয়াত।

৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তা'লীমাত।

৪২. Mohammed Kasim Ferishta : History of the rise of the Mohamedan Power in India. Translated in english by John Briggs.

৪৩. Willian Hunter : Our Indian Musalmans.
৪৪. Noorullah & Naik : History of Education in India.
৪৫. A. R. Mullick : British Policy & Muslim Bengal.
৪৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভি ঃ ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূঁকে উরূজ ও যাওয়াল কা আসার।
৪৭. মওলানা মাসউদ আলম নাদভি ঃ হিন্দুস্থান মে ইসলাম কি পহেলি তাহরীক।
৪৮. মোহাম্মদ আজিজুল হক ঃ বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা।
৪৯. খুররম মুরাদ ঃ সীরাতে রাসূলের আয়নায় ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী। আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।
৫০. আবদুর রহমান আযযাম ঃ মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, আবু জাফর অনূদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০।
৫১. সাইয়েদ কুতুব ঃ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, আবদুল খালেক অনূদিত। আধুনিক প্রকাশনী।
৫২. মোহাম্মদ আবদুল আযীয ঃ উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ। প্যারাগন পাবলিশার্স ঢাকা।
৫৩. ইমাম ইবনে কুদামা ঃ মিনহাজুল কাসেদীন।
৫৪. বুদ্ধদেব বসু ঃ কালের পুতুল। নিউ এজ সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৯।
৫৫. আবু সায়ীদ আইয়ুব ঃ পথের শেষ কোথায়। দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।
৫৬. বুদ্ধদেব বসু ঃ সাহিত্য চর্চা। দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা ১৯৯২।
৫৭. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন। কথাকলি, ঢাকা।
৫৮. আবদুল আযীয আল আমান ঃ সাহিত্য-সঙ্গ। ৩য় সংস্করণ কলকাতা ১৩৭৬ বাংলা।
৫৯. রফিকুল ইসলাম ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা। বাঙলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭১।
৬০. তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা কাব্য। অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৮৪ বাংলা।
৬১. হাসান হাফিজুর রহমান ঃ আধুনিক কবি ও কবিতা। বাঙলা একাডেমী ঢাকা।
৬২. ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙলা নাটক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ ১৯৬৪।
৬৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ বাংলা কবিতার ছন্দ। প্রথম প্রকাশ ১৯৭০।
৬৪. ডঃ সত্য প্রসাদ সেন গুপ্ত ঃ ইংরেজী সাহিত্যের দ্বাদশ সূর্য। মুক্তধারা দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৬।

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
পবিত্র জীবন
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নাতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

• কিশোর ও যুবকদের জন্যে বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

• অনূদিত কয়েকটি বই

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিক্হুস সুন্নাহ্ ১ম - ৩য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

• এছাড়াও আরো অনেক বই

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com